বিজ্ঞানের আলোকে কুরআন ও বাইবেল

সূচিপত্র

ডা.উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : বাণী ও শব্দের অর্থগত পার্থক্য

'আলাক' শব্দের মমার্থ

প্রসঙ্গ : ভ্রুণতত্ত্ব বাইবেলে ভ্রুণতত্ত্বের স্তর

ভ্রণের স্তর সম্পর্কে এরিস্টটল

ভারতীয় চিকিতসা বিজ্ঞানে ভ্রুণের স্তর

ভ্রুণের স্তর সম্পর্কে গ্যালেন

'নূর' আলো 'সিরাজ' বাতি

'মুনীর' ধারকৃত আলো 'নূর' আলোর প্রতিফলন

চাদের নিজস্ব আলো নেই

বাইবেলে পানিচক্র

জমিনে স্থাপিত পর্বতমালা স্থির ও নিশ্চল

ডা. জাকির নায়েক : কুরআনে বিজ্ঞান সম্পর্কিত আয়াত সহস্রাধিক

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা নিশ্চিত করেছে আধুনিক বিজ্ঞান

সূর্য ও পৃথিবী পরিভ্রমণ করছে নিজ কক্ষপথে

আল কুরআনে পানি চক্র

পাহার পৃথিবীর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রথিত

পাহাড় ভূমিকম্প রোধ করে কুরআন বলে নি

'বারযাখ' অদৃশ্য প্রতিবন্ধক

কুরআন ও হাদীস ভ্রুণতত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

আললাহ নিজস্ব আলোর প্রতিফলন ঘটান

মুহাম্মাদ (সা) নূর ও সিরাজ

কুরআনের একটি আয়াতও প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের বিপরীত নয়

'ইলমে গায়িব' তথা অদৃশ্যের জ্ঞান জ্বিনদের নেই

দুধ উতপাদন ও তার ব্যবহার সম্পর্কে কুরআন

কুরআনের সাথে বিজ্ঞান সামঞ্জস্যপূর্ণ

বাইবেল ও বিজ্ঞানের বৈসাদৃশ্য

পর্যালোচনা

Dr. Zakir Naik Rochona Somogro – 1

Chapter 2

Quran and Bible In The Light of Science

Contents
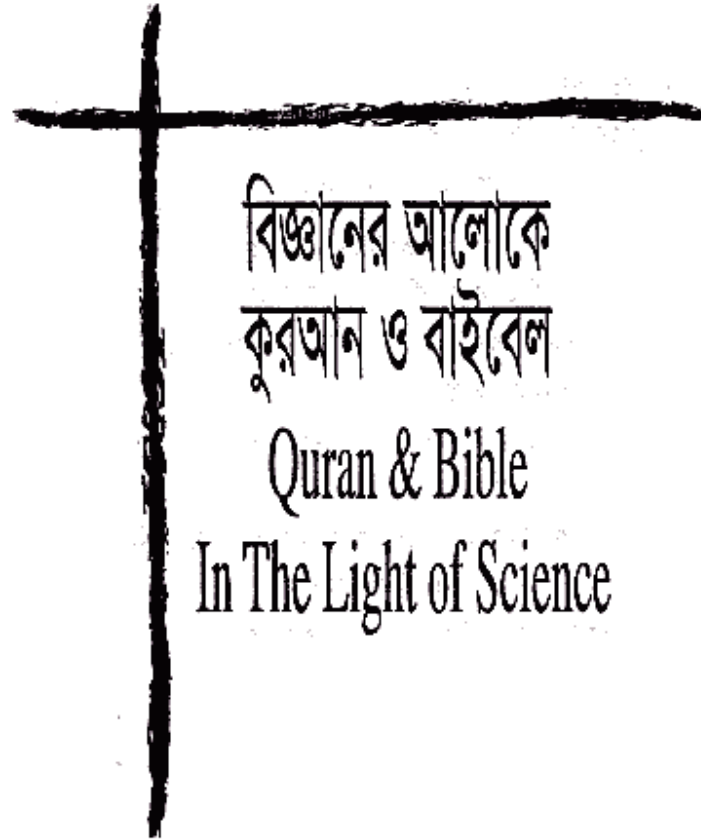
ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল

বাণী ও শব্দের অর্থগত পার্থক্য

পর্যালোচনার শুরুতেই 'বাইবেলের বাণী' এবং 'কুরআনের বাণী' সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতগণ আমাদের বলেছেন যে একটি বাণী, একটি বাগধারা কিংবা একটি বাক্য অর্থ হচ্ছে– বক্তা তাকে কী অর্থে ব্যবহার করেন এবং যেসব ব্যক্তি বা সমষ্টিগত লোকেরা তা শোনে তারা কী বুঝছেন। কুরআনের ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (স) কী বোঝাতে চেয়েছেন এবং উপস্থিত লোকেরা কী বুঝেছেন সেটাই বাণীর মর্মার্থ। বাইবেলের ক্ষেত্রে হযরত ঈসা (আ) কী বোঝাতে চেয়েছেন এবং উপস্থিত লোকেরা কী বুঝেছেন তা-ই বাণীর মর্মার্থ। বিষয়টি নিরীক্ষা করার জন্য আমাদেরকে বাইবেল কিংবা কুরআনের সকল ব্যবহারকারীদের ভাষ্য বুঝতে হবে।

যদি আমরা সত্যকে অনুসরণ করতে চাই তাহলে আমরা নতুন অর্থ বানাতে পারি না। আমরা যদি সত্যের ব্যাপারে অধিক যত্নশীল হই, তাহলে মিথ্যার ব্যাপারে অনুমতিপ্রাপ্ত হতে পারি না। আমি যে ব্যাপারে কথা বলছি সে বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। প্রথম দৃশ্য এখানে উপস্থাপন করছি। এ দৃশ্যটি আমার বাড়িতে থাকা দুটি অভিধান সম্পর্কে। যার একটি ১৯৫১ এবং অপরটি ১৯৯১ সালের। এ অভিধান দুটিতে 'পিগ্' শব্দের প্রথম অর্থ হচ্ছে, 'বিপরীত লিঙ্গের যুবক শূকর।' দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, 'যেকোনো ধরনের শূকর কিংবা খাসি করা শূকর।' 'যেকোনো বন্য কিংবা গৃহপালিত শূকর'- এটা একই অর্থ প্রকাশ করছে। তৃতীয় অর্থ হচ্ছে– 'শূকরের মাংস'-এটাও সমান অর্থ প্রকাশ করছে। এরপর এ নির্দিষ্ট শব্দটির অর্থ হচ্ছে– 'এমন ব্যক্তি বা প্রাণী যার শূকরের মতো অভ্যাস রয়েছে।' এ অর্থটি হচ্ছে 'অতিভোজনে পটু ব্যক্তি'– অর্থের সমান। আর এ অর্থটি এখানে উল্লেখিত হয়েছে, 'গলিত ধাতব পদার্থকে মাটির গর্তে ঢালাই না করা লৌহপিণ্ডের জন্য ঢেলে দেয়া।' কিন্তু এখানে 'পিগ' শব্দটির একটি নতুন অর্থ দাঁড়িয়েছে যা হচ্ছে 'একজন পুলিশ কর্মকর্তা।' আমরা বলি 'পুলিশ অফিসারের পিগ'। এসব নতুন কোনো অর্থ আমাদের গ্রহণ করা উচিত নয়। আমাদের অবশ্যই প্রথম শতাব্দীতে শব্দটির যে অর্থ বাইবেল, গসপেল এবং প্রথম হিজরি শতাব্দীতে কুরআনে গ্রহণ করা হয়েছিল তাই গ্রহণ করা উচিত।

'আলাক' শব্দের মর্মার্থ

ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে একটি ভুল তথ্য প্রচলিত রয়েছে। প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে, আধুনিক তত্ত্বে যে ভ্রূণের কথা বলা হয় তা বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে উন্নতি বা পরিপূর্ণতা অর্জন করে। আর কুরআন অনেক পূর্বেই আধুনিক ভ্রূণতত্ত্বের স্তরসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করেছে। ডা. কেউথ মুর তাঁর Highlights of Human Embryology বইতে দাবি করেছেন, এ স্তরসমূহের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা অর্জনের বিষয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বিশ্লেষণের জন্য কোনোরূপ আলোচনা হয়নি। প্রথমত আমরা তার এ দাবি পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত 'আলাক' শব্দটির অর্থ বিবেচনায় নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করবো। দ্বিতীয়ত, পবিত্র কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত অবতীর্ণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে তাও যাচাই করে দেখবো।

সংশ্লিষ্ট আয়াতে যে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে আমরা সেই 'আলাক' শব্দটির দিকে লক্ষ করেই শুরু করবো। আরবি শব্দ 'আলাক' একবচন। অথবা 'আলাক' শব্দটি বহুবচন এবং এটা ছয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। পবিত্র কুরআনের 'সূরা কিয়ামা'-এর ৩৭-৩৯ আয়াতে বলা হয়েছে–

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى . ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى . فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى .

অর্থ : আর মানুষ কি নির্গত হওয়া শুক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে 'আলাক' তথা জমাট রক্তে পরিণত হয় এবং আল্লাহ তাকে সুন্দর আকৃতিতে রূপ দান করেছেন। এরপর তা থেকে তিনি স্ত্রী ও পুরুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।'

পবিত্র কুরআনের সূরা মু'মিনের ৬৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا .

অর্থ : 'তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদের মাটি থেকে, অতঃপর শুক্রবিন্দু থেকে, অতঃপর 'আলাক' তথা জমাট রক্তবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর শিশু হিসেবে বের করেছেন।'

পবিত্র কুরআনের সূরা হাজ্জের ৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ .

অর্থ : হে মানবমণ্ডলী! যদি তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে থাক তাহলে জেনে রাখ যে, আমি তোমাদের মাটির নির্যাস থেকে, অতঃপর শুক্রকীট

থেকে, অতঃপর 'আলাক' তথা জমাট রক্তপিণ্ড থেকে, অতঃপর আকৃতি বিশিষ্ট এবং আকৃতিবিহীন ছোট গোশতের টুকরা থেকে সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারি।

আর পবিত্র কুরআনের সূরায়ে মু'মিনূনের ১২ থেকে ১৪ নং আয়াতে চূড়ান্তভাবে এই কথাগুলো বর্ণনা করা হয়েছে–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِنْ طِيْنٍ ۔ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِىْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ۔ ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ ۔

অর্থ : আর নিশ্চয়ই আমি মানুষকে মাটির আর্দ্রতা বা ভেজা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাকে আমি নিরাপদ বেষ্টনির ভেতরে শুক্রাণুরূপে রেখেছি। তারপর ঐ শুক্রাণুকে 'আলাক' তথা জমাট রক্তপিণ্ডে পরিণত করেছি। এরপর ঐ জমাট রক্তপিণ্ডকে গোশতের টুকরায় এবং ঐ গোশতের টুকরাকে হাড়ে এবং ঐ হাড়কে গোশত দ্বারা আবৃত করেছি। অতঃপর ঐ সৃষ্টিকে আমি অন্যরূপে সৃষ্টি করবো।

পবিত্র কুরআনে সূরা মু'মিনুন-এ স্পষ্ট ভাষায় মানব সৃষ্টির স্তরসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন– নুতফা (শুক্রাণু), আলাক (রক্তপুঞ্জ), মুদগা (গোশতের টুকরা), ইযাম (হাড়) এবং পঞ্চম স্তর হচ্ছে 'হাড়কে গোশতের দ্বারা আবৃত করা'। গত শতাব্দীর শুরু থেকে আরো বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত 'আলাক' শব্দটির অনুবাদ করা হয়েছে নিম্নরূপ :

'আলাক' শব্দটির অর্থ রয়েছে দশটি। আমি এখানে সব উল্লেখ করতে চাচ্ছি না। এদের মধ্যে তিনটি হচ্ছে ফরাসি ভাষায় যেমন, রক্তপিণ্ড। ইংরেজি ভাষায় এর ৩ থেকে ৫টি পরিভাষা রয়েছে যাতে এর অর্থ হয়তো রক্তপিণ্ড নতুবা জোঁকের মতো লেগে থাকা রক্তপিণ্ড। শেষ পরিভাষাটি হচ্ছে ফরাসি যার অর্থ রক্তের একটি জমাট পিণ্ড। মানবের জন্মবৃত্তান্ত যারা অধ্যয়ন বা গবেষণা করেছেন তারা বুঝতে পেরেছেন যে, ভ্রূণ গঠনকালীন 'জমাট রক্তপিণ্ড' নামের কোনো স্তরের অস্তিত্ব নেই। সুতরাং এটা একটা বড় ধরনের বৈজ্ঞানিক সমস্যা। অভিধানে এটা এমন একটা শব্দ যা শুধু 'আলাক' শব্দের মর্মার্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীবাচক 'আলাকা' শব্দের একবচনের অর্থ হচ্ছে, Clot বা ঘনীভূত তরল দ্রব্য এবং Leech বা জোঁক। উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে এ দুটি অর্থই এখনও ব্যবহৃত হয়।

আমার কাছে কয়েকজন রোগী এসে কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়া জমাট রক্ত সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। আর কয়েকজন মহিলা আমার নিকট এসে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেছিল, তাদের মাসিক স্রাব আসছে না কেন? তখন আমি তাদের বলেছিলাম যে, 'আমি দুঃখিত, আমি আপনার স্রাব নির্গত করার ওষুধ দিতে

পারবো না। কারণ আমি বিশ্বাস করি যে আপনার পেটে বাচ্চা রয়েছে।' তারা বললো, 'এটা তো এখনো রক্ত মাত্র'। সুতরাং তাদের একথা থেকে বোঝা গেল যে, তারা পবিত্র কুরআনের ধারণাটি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে।

সর্বশেষে আমরা প্রথম আয়াতটি সম্পর্কে আলোচনা করবো, যা মহানবী (স) এর মক্কী জীবনে অবতীর্ণ হয়েছিল। এ আয়াতটি পবিত্র কুরআনের সূরা আলাক-এ সংযোজিত আছে। এ আয়াতটি হলো–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۔

অর্থ : পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে 'আলাক' তথা জমাট রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন।

শব্দটি এখানে সমষ্টিবাচক রূপে আছে। শব্দটির এ রূপটি অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ, 'আলাক' শব্দটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য 'আল-আলাকু' (العَلَقُ) শব্দ থেকেও উৎপত্তি হতে পারে। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য সাধারণত এভাবে ব্যবহৃত হয় যে 'সাঁতার কাটা একটি বিনোদন।' অতএব আমরা প্রত্যাশা করতে পারি যে 'আলাক শব্দটির অর্থ ঝুলানো বা দৃঢ়ভাবে লেগে থাকা কিংবা বিচ্যুত না হওয়া। কিন্তু উপরোল্লিখিত দশটি অনুবাদেই এ শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'জমাট রক্তপিণ্ড।'

এসব অনুবাদ যারা ব্যবহার করেছেন তাদের মধ্যে ফ্রান্সের ড. মরিস বুকাইলি সংখ্যা এবং যোগ্যতার বিচারে অত্যন্ত স্পষ্ট করে বলেছেন, এর অর্থ 'জমাট রক্ত' নয়। অধিকাংশ অনুবাদেই একথা বলা হয়েছে 'মানুষের গঠন হয়েছে জমাট রক্ত থেকে'। এ ক্ষেত্রে এ ধরনের বর্ণনা বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীদের নিকট সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য। এখন দেখা যাচ্ছে, বিশ্লেষণ অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ বিষয়ে যেসব মতপার্থক্য রয়েছে তার জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মানব জন্মের বৃত্তান্ত সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনার মর্মার্থ উপলব্ধি করা দরকার।

আলাক শব্দের অনুবাদ সম্পর্কে ড. মরিস বুকাইলি বলেছেন, 'আমি ছাড়া কেউ কুরআনের এ শব্দটির যথার্থ অনুবাদ করেনি।' এ শব্দটির অনুবাদ করতে গিয়ে কত সুন্দর করে তিনি চিন্তা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আলাক' শব্দটির অনুবাদ 'জমাট রক্তের' পরিবর্তে 'যা কিছু এঁটে থাকে' হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ গর্ভবতী অবস্থায় নারীর জরায়ুর ভেতরে যে ভ্রূণ এঁটে থাকে তা। কিন্তু বলা হয়েছে, যেসব মহিলা গর্ভবতী হন, তাদের গর্ভে যা এঁটে থাকে তা একইভাবে থাকে না বরং তা চর্বিত গোশতের টুকরার মতো হয়ে যায়। তাই এর দ্বারা গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভে ৮ মাস কিংবা সাড়ে ৮ মাস ধরে যে বস্তু এঁটে থাকে ঐ বস্তুটিকে বোঝায় না। কার্যত এসব আয়াতে বলা হয়েছে, 'চর্বিত গোশত ধীরে ধীরে হাড়ে পরিণত হয় এবং তখন ঐ হাড় মাংসপেশী দ্বারা ক্রমান্বয়ে আবৃত হয়ে যায়।'

Contents

আয়াতগুলোতে বুঝানো হয়েছে, প্রথম অবস্থায় কঙ্কাল তৈরি হয় এবং এরপরে এটাকে মাংসের দ্বারা আবৃত করা হয়। আর ড. বুকাইলি অত্যন্ত সুচারুরূপে বুঝেছেন যে এটা সত্য নয়। মাংসপেশী এবং উপাস্থি (Cartilage) একই সময়ে সংগঠন প্রক্রিয়া শুরু করে এবং ৮ সপ্তাহ শেষে ঘনীভূত হয়ে কয়েকটি বিশেষ কেন্দ্রে একত্রীভূত হয়। কিন্তু ভ্রূণ ইতোমধ্যে মাংসপেশীর মতো নড়াচড়া করতে সক্ষম হয়।

ভ্রূণতত্ত্ববিদ ড. টি. ডব্লিউ. স্যাডলার যিনি 'Longman's Medical Embryology' নামক বই রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনি একটি ব্যক্তিগত পত্রে লিখেছেন, 'আট সপ্তাহ শেষ হলে ভ্রূণগুলো উপ-অস্থিতে পরিণত হয়, আর তখন হাড় বা মাংসপেশীর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। এ সময়েই ঐগুলো শক্ত হতে শুরু করে। ৮ম সপ্তাহ পরে মাংসপেশি কিছুটা নড়াচড়া করতে থাকে।' সব সময় দু'জন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা অধিকতর নির্ভরযোগ্য। তাই স্যাডলারের পর আমরা ড. কেইথ মুর তাঁর 'The Developing Human' গ্রন্থে মানুষের অস্থি এবং মাংসপেশির উন্নয়ন সম্পর্কে যা বলেছেন তা নিরীক্ষা করে দেখবো। উক্ত বইয়ের ১৫তম এবং ১৭তম অধ্যায় অধ্যয়ন করে আমরা যেসব তথ্য পাই তা হলো–

এখানে ড. স্যাডলার এবং ড. মুর এ ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন যে, চূর্ণীভূত হাড় গঠনের এবং তার চারদিকে গোশতের আবরণ সৃষ্টি হওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী চূর্ণীভূত হাড় গঠিত হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই সেখানে গোশতের অস্তিত্ব থাকে। আর তাই হাড়ের চারদিকে গোশতের আবরণ সৃষ্টির কথা যথার্থ নয়। তাহলে কুরআন এ বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছুটা ভুল তথ্য প্রদান করেছে।

এবার আমাদের 'আলাক' শব্দের দিকে ফিরে আসা উচিত। ড. মুরও এ ব্যাপারে একটি সমাধান দিয়ে বলেছেন, পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত 'আলাক' শব্দের অর্থ জোঁকের মতো লেগে থাকা তথা দৃশ্যমান কোনো কিছু এবং চর্বিত বস্তু যেমনটা মানবীয় রূপান্তরের একটি স্তরে ঘটে থাকে। এ সংজ্ঞার মধ্য দিয়ে ড. মুর একটু আগ বাড়িয়েছেন এই উদ্দেশ্যে যে, ২৩-৩০ দিন ধরে অর্থাৎ ২৩ দিনের একটি শুক্রাণু ৩ মিলিমিটার দীর্ঘ অর্থাৎ $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি শুক্রাণু যেখানে আমিন আমার আঙ্গুলি স্পর্শ ছাড়া রাখতে পারি না বললেই চলে। এটা হচ্ছে ড. মুর কর্তৃক রচিত বইয়ের কভারে প্রদর্শিত স্তরসমূহের ১০ম স্তর। এটাই শুরু এবং এখান থেকে শুক্রাণু ডিম্বাণুর ভেতর প্রবেশ করে। সুতরাং এটাই প্রথম স্তর। দ্বিতীয় সপ্তাহে সেখান থেকে ৬ষ্ঠ স্তরে নেমে আসে। আর এখানে ১ম স্তর হচ্ছে ১০ম স্তর এবং এটা হচ্ছে ২৩ দিনের ঘটনা। এটাকেই ড. মুর 'জোঁকের মতো লেগে থাকা' শব্দের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন। যদি আমরা 'এক্স-রে'এর দিকে তাকাই

তাহলে দেখবো ইতোমধ্যে ২২ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং মেরুদণ্ডটি এখন পর্যন্ত খোলা। আর যদি ২৩ দিনের দিন আমরা তার দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখবো মেরুদণ্ড এবং মাথার উভয়ই খোলা। এটা দেখতে কোনোক্রমেই জোঁকের লেগে থাকার মতো নয়। আর যদি এর চিত্রের দিকে খেয়াল করি তবে দেখতে পাবো যে, এর মাথাটি খোলা এবং এটি একটি ২০ দিনের শুক্রাণু। এটি ডিমের কুসুমের স্থলির রূপ নেয়, মাতৃজঠরে ভ্রূণের নাভির সাথে মায়ের ফুলের সংযোজক নালীর রূপ পরিগ্রহ করে। কোনো ক্রমেই এটি জোঁকের মতো লেগে থাকার মতো নয়। এ দুটি সংজ্ঞার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা সৃষ্টি করেছে 'আলাক' শব্দটির অর্থ নির্ণয়ে। কেননা এ শব্দের কোনো গ্রহণযোগ্য উপমা অন্য কোনো আরবি শব্দ দ্বারা দেয়া সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য যে, হিজরি সালের প্রথম শতাব্দীতে 'আলাক' শব্দটির অর্থ নির্ণয় করা হয়েছে ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে। পবিত্র কুরআনের সূরা মুমিনুন-এ আল্লাহ তাআলা বলেছেন.–

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا .

অর্থ: অতঃপর বীর্যকে নিরাপদ স্থানে স্থির করে দিয়েছি। অতঃপর বীর্যকে জমাট রক্ত পিণ্ডে পরিণত করেছি। এরপর রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে এবং মাংসপিণ্ড থেকে হাড় তৈরি করেছি। পরিশেষে হাড়কে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি।

এখানে 'আলাক' শব্দের অর্থ হয়তো আপনি বুঝতে পেরেছেন। অপরদিকে সূরা হাজ্জ-এর ৫ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ .

অর্থ : হে মানবগোষ্ঠী! যদি তোমরা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ কর তবে জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মটি থেকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর বীর্য থেকে, অতঃপর জমাট রক্তপিণ্ড থেকে, অতঃপর মাংসপিণ্ড থেকে, যাতে তোমাদের নিকট সৃষ্টির বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে পারি।

অতএব এখান থেকে একটি প্রশ্ন সহজেই উত্থাপিত হতে পারে যে, যদি মক্কা ও মদিনার নারী ও পুরুষদের নিকট 'আলাক' শব্দের অর্থ পরিষ্কার না-ই থাকতো তাহলে কোন্ বিষয়টি তাদের পুনরুজ্জীবনের বিশ্বাসের দিকে ধাবিত করেছিল? এর সহজ উত্তর হচ্ছে, 'আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং সাহাবীরা ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কে কী ভাবতেন তা খতিয়ে দেখার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সময়কাল পর্যন্ত ঐতিহাসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করেছি।'

Contents

প্রসঙ্গ : ভ্রূণতত্ত্ব

বাইবেলে ভ্রূণতত্ত্বের স্তর

বাইবেল বর্ণিত যিশুখ্রিস্টের জন্মের কথা দিয়ে শুরু করছি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, যিশু গ্রিক দ্বীপের 'কুশ' নামক জায়গায় জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মগ্রহণের সময় তিনি কতগুলো স্তর পার হয়ে এসেছেন। তাঁর স্তরগুলো ছিল– শুক্রাণু বা একটি উৎপাদিত বস্তু যা প্রত্যেক পিতার-মাতার সমস্ত শরীর থেকে আসে। দুর্বল শুক্রাণু আসে দুর্বল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে আর শক্তিশালী শুক্রাণু আসে শক্তিশালী অঙ্গ-প্রতঙ্গ থেকে। এটা মায়ের রক্তে ঘনীভূত হয়। তখন শুক্রবীজ ঝিল্লিতে পরিণত হয়। অধিকন্তু, এটা মায়ের রক্তের কারণে বৃদ্ধি পায়, পরবর্তীতে গর্ভে পরিণত হয়। যদি কোনো মহিলা একবার গর্ভধারণ করে তাহলে তার হায়েজ বন্ধ হয়ে যায়।

এখন আমরা Old Testament সম্পর্কে আলোচনা করব। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনানুযায়ী যিশুখ্রিষ্ট গ্রিক দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন আর তাঁর জন্মের ক্ষেত্রেও স্তরসমূহ তাকে পেরিয়ে আসতে হয়েছিল।

শুক্র ও বীর্য হচ্ছে একটি উৎপাদ বা উৎপন্ন দ্রব্য যা পিতা-মাতার সমগ্র শরীর থেকে উৎপাদিত হয়– দুর্বল বীর্য শরীরের দুর্বল অংশ থেকে এবং শক্তিশালী বীর্য শরীরের শক্তিশালী অংশ থেকে উৎপাদিত হয়। অতঃপর তিনি সামনে এগিয়ে গেলেন এবং মায়ের রক্তের ঘনীভূত অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করলেন। বীজ শুক্রাণু তখন ঝিল্লিতে আশ্রয় নেয়। অধিকন্তু এটি বেড়ে ওঠে কারণ এটা মায়ের রক্ত, ডিম্বাশয়ের ভেতরে অবতরণ করেছে। কোনো মহিলা গর্ভধারণ করলে সে ঋতুবতী হতে পারে না।

মাংসপিণ্ড সম্পর্কে তিনি বলেছেন, এ স্তরে মায়ের ঘনীভূত রক্ত নির্গত হওয়ার ফলে মাংসপিণ্ডের গঠন শুরু হয়, নাড়ী সৃষ্টি হয় এবং সবশেষে হাড় সৃষ্টি হয়ে থাকে। তিনি বলেছেন, 'মাংসপিণ্ড যেহেতু গড়ে ওঠে, তাই তা আলাদাভাবে শ্বাস গ্রহণের জন্য নতুন সদস্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করে, হাড় শক্ত হয়ে ওঠে এবং গাছের শাখা প্রশাখার ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে।'

ভ্রূণের স্তর সম্পর্কে এরিস্টটল

আমরা বিশ্বসেরা দার্শনিক এরিস্টটলের বক্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করবো। প্রাণীর উৎপাদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তাঁর বইতে তিনি ৩৫০ খ্রিস্টপূর্ব সালে ভ্রূণের স্তর সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলেন এবং একইভাবে তিনি প্রথম বীর্য এবং 'ঋতুকালীন রক্ত' সম্পর্কে

আলোচনা করেছিলেন। এরিস্টটল পুরুষদের বীর্য সম্পর্কে বলেছেন, এটা প্রকৃত অবস্থায়ই থাকে। মহিলাদের বীর্য পুরুষদের বীর্যের প্রতি কোন্ ধরনের প্রভাব বিস্তার করে তারই অনুসরণ করে থাকে এবং কার্যপ্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আরও সহজ ভাষায় বলা যায়, বীর্য ঋতুস্রাবের রক্তকে জমাট বাধতে সাহায্য করে এবং এটা ধীরে ধীরে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। তিনি বলেছেন, প্রাকৃতিক নিয়মেই শুক্রাণু এ মাংসের আকারে আঁশের ন্যায় পাতলা তন্তু দ্বারা সংযোজিত হয়, বেড়ে ওঠে এবং মাংস ও হাড়ের অংশের প্রাণ রাসায়নিক বন্ধন রচিত হয়। পরিষ্কারভাবে পবিত্র কুরআনও এই একই বক্তব্যের সমর্থক। ঋতুস্রাবের রক্ত জমাটবদ্ধ হয়েই মাংসপিণ্ডের জন্ম হয়, যা মাংস গঠনে সাহায্য করে করে। এরপরে, হাড় গঠিত হয় এবং পরিশেষে হাড়ের চারদিকে মাংস দ্বারা আচ্ছাদিত হয়।

ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে ভ্রূণের স্তর

আমরা ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করব। শারাকাতার (১২৩ খ্রিস্টাব্দ) এবং শুশ্রূষার মতামত হচ্ছে, মহিলা এবং পুরুষ উভয়েই বীর্যপাত করে থাকে। পুরুষের বীর্যকে বলা হয় 'শুক্রকীট' আর মহিলাদের বীর্যপাতকে বলা হয় 'আর্তযা রক্ত'। আর এসব নির্গত হয় শরীরের রক্ত থেকে, যে রক্ত উৎপাদিত হয় গৃহীত খাদ্যদ্রব্য থেকে। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে এ ধারণাই পোষণ করা হয় যে শিশুর শরীর গঠিত হয় বীর্য এবং রক্ত থেকে।

ভ্রূণের স্তর সম্পর্কে গ্যালেন

আমরা এখন গ্যালেনের দিকে দৃষ্টিপাত করব যিনি ১৩১ খ্রিস্টপূর্ব সালে বার্গামামে জন্মগ্রহণ করেন। বার্গামাম বর্তমানে তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত। গ্যালেন বলেছেন, বীর্য অর্থাৎ সারাংশ যা হতে শুক্রাণু গঠিত হয়, তা আসলে ঋতুস্রাবের রক্ত থেকে হয় না, যা ইতিপূর্বে এরিস্টটল বলেছেন। আসলে তা ঋতুস্রাবের রক্ত এবং দুটি শুক্রাণু ও ডিম্বাণু থেকে গঠিত হয়।

পবিত্র কুরআন এখানে গ্যালেনের কথার সাথে একমত। যেমন ৭৬ নং সূরা দাহার এর ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে– إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ .
অর্থ : আমি মানুষেকে মিশ্রিত বীর্যের ফোঁটা থেকে সৃষ্টি করেছি।

আমরা এখন গ্যালেনের দেয়া শুক্রাণুর স্তর সম্পর্কে আলোকপাত করব। গ্যালেনও বলেছেন, ভ্রূণ কয়েকটি স্তরের মধ্য দিয়ে উন্নতি লাভ করে। প্রথমটি হচ্ছে বীর্যের রূপ পরিগ্রহকরণ। পরবর্তী স্তরগুলো হচ্ছে বীর্যের রক্তে পরিণত হওয়া, আর হৃদয়, মস্তিষ্ক এবং পরিপাকতন্ত্রের অগঠিত অবস্থায় থাকা। এ স্তরটিকে হিপোক্রাটাস অভিহিত করেছেন 'ফেটাস' বলে।

পবিত্র কুরআনের সূরা হাজ্জ এর ৫ নং আয়াতে উপরোক্ত বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটেছে। যেমন আল্লাহ বলেন–

ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ.

অর্থ : তারপর রক্তপুঞ্জ হতে, অতঃপর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড হতে তোমাদের নিকট ব্যক্ত করার জন্য আংশিকভাবে রূপ দেয়া হয়েছে।

উপরে আমরা দেখলাম যে পবিত্র কুরআন এ স্তরের সাথে একমত পোষণ করেছে। পবিত্র কুরআনের সূরা মুমিনুন এর ১৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا.

অর্থ : অতঃপর আলাকাকে পরিণত করি পিণ্ডে, তারপর পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পঞ্জরে, আমি হাড়কে মাংস দ্বারা আবৃত করে দিয়েছি।

আর চূড়ান্ত স্তরে শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই আলাদাভাবে সুসংগঠিত রূপে প্রকাশ পায়। গ্যালেন চিকিৎসাবিজ্ঞানে এতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন যে, চতুর্থ হিজরি শতাব্দীতে আলেকজান্দ্রিয়া, মিসর প্রভৃতি স্থানের বার জন বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী একটি মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যে স্কুলে গ্যালেনের ১৬টি বইকে পাঠ্য হিসেবে নিয়ে তার ভিত্তিতে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছিল। ১৩ শতাব্দী পর্যন্ত ঐ বইগুলো পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, এসব বছরগুলোতে ভ্রূণতত্ত্বের ওপর কুরআনের আয়াতগুলো ঘোষণা করেছে যে, মানুষের সৃষ্টি হয়েছে এক বিন্দু শুক্রাণু থেকে, যা ধীরে ধীরে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। এ বক্তব্যটি বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা হিজরি ১ম শতাব্দীতে কুরআন বলে দিয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে যখন আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে তুলনা করা হয়, তখন দেখা যায় হিপোক্রাটাস ভুল করেছেন, এরিস্টটল ভুল করেছেন, গ্যালেন ভুল করেছেন– ভুল করেছেন এরা সবাই।

'নূর' আলো 'সিরাজ' বাতি

এবার আমরা 'চাঁদের আলো' সম্পর্কে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করতে চাই। পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছে, চাঁদকে সূর্যের আলো থেকে একটু প্রতিফলিত আলো দেয়া হয়েছে। যেমন : পবিত্র কুরআনের সূরা নূহ এর ১৫-১৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا . وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا .

অর্থ : তোমরা কি দেখ না, কীভাবে আল্লাহ সপ্ত আসমান স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন? আর তিনি তাদের মধ্যে চাঁদকে করেছেন 'নূর' বা জ্যোতি এবং সূর্যকে করেছেন বাতি বা সিরাজ।

আলো বা 'নূর' এবং সূর্যকে বলা হয়েছে বাতি বা 'সিরাজ'। মুসলিম গবেষকদের কেউ কেউ দাবি করেন যেহেতু কুরআন ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ব্যবহার করেছে, অতএব এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সূর্য হচ্ছে আলোর উৎস আর চাঁদ হচ্ছে কেবল আলোর প্রতিফলন। এ দাবিটি অত্যন্ত জোরালোভাবে ধরা হয়েছে ইসলামী চিন্তাবিদ সাব্বির আলী প্রণীত 'Science in the Quran' শীর্ষক গ্রন্থে। [একই কথা পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে ডা. জাকির নায়েকের 'Is not the Quran God's Word?' শীর্ষক আলোচনায়।]

'মুনীর' ধারকৃত আলো 'নূর' আলোর প্রতিফলন

'মুনীর' হচ্ছে ধারকৃত আলো আর 'নূর' হচ্ছে আলোর প্রতিফলন। আমরা ইতোপূর্বে জানতাম চাঁদের আলো তার নিজস্ব। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে এখন আমরা জানি চাঁদের আলো এর নিজস্ব নয়, বরং এটা সূর্যের আলোর একটি প্রতিফলন মাত্র। আমি তাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই, যার বর্ণনা দেয়া হয়েছে পবিত্র কুরআনের ২৫তম সূরা ফোরকানের ৬১নং আয়াতে। এতে বলা হয়েছে– تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا .

অর্থ : বরকতময় সেই সত্তা যিনি আকাশে কক্ষপথ স্থাপন করেছেন, আর তাতে সিরাজ এবং উজ্জ্বল চাঁদকে স্থাপন করেছেন।

আরবিতে চাঁদকে বলা হয় 'ক্বামার' এবং তাতে যে আলো প্রতিফলিত হয় তাকে বলা হয় 'মুনীর'। এটা হচ্ছে ধারকৃত আলো কিংবা 'নূর'-যার অর্থ হচ্ছে 'আলোর একটি প্রতিফলন মাত্র'। পবিত্র কুরআন বলেছে, চাঁদের আলো হচ্ছে প্রতিফলিত আলো। আপনারা বলতে পারেন বিজ্ঞান আজকে এটা আবিষ্কার করলেও প্রশ্ন হলো, আজ থেকে ১৪০০ শত বছর পূর্বে কীভাবে কুরআন তা বলে দিয়েছিল?

আমার জানামতে, ডা জাকির নায়েক 'চাঁদ' শব্দের আরবি প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন 'ক্বামার' এবং এতে যে আলো প্রতিফলিত হয় তাকে বলেছেন 'মুনীর' যার অর্থ ধারকৃত আলো কিংবা 'নূর' যার অর্থ আলোর একটি প্রতিফলন মাত্র। দয়া করে তিনি যা বলেছেন তা ভুলে যাবেন না– 'মুনীর' হচ্ছে ধারকৃত আলো এবং 'নূর' হচ্ছে 'আলোর প্রতিফলন'। এটা শুধু বৈজ্ঞানিক সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্য নয়, বরং এ বক্তব্য বৈজ্ঞানিকভাবে অলৌকিক প্রমাণিত হতে পারে। কারণ, এটা সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত একটি তুলনামূলক ও ধারণামূলক সত্য মাত্র।

চাঁদের নিজস্ব আলো নেই

একথা ঠিক যে, চাঁদ তার নিজস্ব আলো পৃথিবীতে প্রেরণ করতে পারে না, বরং শুধু সূর্যের আলো প্রতিফলন ঘটাতে পারে। অর্থাৎ চাঁদের নিজস্ব আলো নেই বরং এটা সূর্যের আলোতে আলোকিত হতে পারে। প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক এ বিষয়টি ঘোষিত হয়েছিল। এরিস্টটল ৩৬০ খ্রিস্টপূর্ব সালে বলেছিলেন, 'পৃথিবী গোলাকার, বস্তুত চাঁদের ওপর পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি দেখে তিনি এ সিদ্ধান্তটি ব্যক্ত করেছিলেন। অর্থাৎ, তিনি শুধু পৃথিবীর ছবিকে চাঁদের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে দেখেছিলেন বলে সহজেই এমনটি বলতে পেরেছিলেন। যদিও তিনি জানতেন না যে চাঁদের আলো তার নিজস্ব আলো নয়।

আপনি যদি এখনো জোর করে বলতে চান যে এটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের একটি যাদু, তাহলে আমরা অবশ্যই নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করব, 'পবিত্র কুরআনের শব্দগুলো কি এ দাবির সত্যতা প্রমাণ করে?' সর্বপ্রথম আমরা দৃষ্টি দিবো 'সিরাজ' শব্দের দিকে। সূরা নূরে এর অর্থ তাই যা ওপরে বলা হয়েছে। সূরা ফুরকানের ৬১ নং আয়াতে যা বলা হয়েছে তার স্বাভাবিক অর্থ হচ্ছে 'বাতি' যা সূর্যকে নির্দেশ করে।

সূরা নাবা-এর ১৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে "সিরাজ ওয়াহহাজা' যার অর্থ হচ্ছে, 'চোখ ধাঁধানো বাতি'। এর দ্বারাও সূর্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরবি শব্দ 'নূর' এবং 'মুনীর' একই আরবি শব্দমূল থেকে উৎপন্ন হয়েছে। 'মুনীর' শব্দটি পবিত্র কুরআনে একাধিক সূরায় এসেছে। এর মধ্যে সূরা আলে ইমরান-এ ৪ বার (১৮৪ নং আয়াতে) সূরা হাজ্জ-এ ১ বার (৮ নং আয়াতে), সূরা লোকমানে ১ বার (২০ নং আয়াতে) এবং সূরা ফাতিরে ১ বার (৩৫ নং আয়াতে)।

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক আল্লামা ইউসুফ আলী 'কিতাবুল মুনীর' শব্দাংশের অনুবাদ করতে গিয়ে বলেছেন, 'আলোর পুস্তক' এবং মার্মাডিউক পিকথল বলেছেন, 'এমন ধর্মগ্রন্থ যা আলো প্রদান করে।' এ থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, এর দ্বারা এমন পুস্তককে ইঙ্গিত করা হয়েছে যা জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করে। 'প্রতিফলন' বলতে 'নূর' শব্দের ব্যবহার সঠিক নয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা ইউনুসের ৫নং আয়াতে বলেছেন–

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا .

অর্থ : তিনি সেই সত্তা যিনি সূর্যকে করেছেন আলোকিত এবং চন্দ্রকে করেছেন উজ্জ্বল।

কাজেই আমরা দেখতে পাই, পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে, চাঁদ হলো আলো। আর এটি কখনোই বলেনি যে চাঁদ আলোর প্রতিফলন ঘটায়। অধিকন্তু অন্যান্য আয়াতে পবিত্র কুরআন বলেছে, আল্লাহ্ হচ্ছেন নূরের আঁধার। যেমন, সূরা নূরের ৩৫নং আয়াতে পবিত্র কুরআন সুন্দর করে বলেছে– اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থ : আল্লাহ পৃথিবী ও আসমানের নূর বা জ্যোতি।

এভাবে আমরা দেখতে পাই যে 'নূর' শব্দটি 'আল্লাহ' এবং 'চাঁদ' উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা কি এটা বলতে চাচ্ছি যে, আল্লাহ প্রতিফলিত আলোতে নিঃসৃত! আমার মনে হয়, এটা সঠিক নয়। কিন্তু যদি আপনি ধারাবাহিকভাবে একথা বলতে চান যে 'নূর' শব্দটি যখন চাঁদকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ হবে 'ধারকৃত' বা 'প্রতিফলিত আলো'। আমরা দেখলাম 'আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের 'নূর'। তাহলে এ আলোর উৎস কী? এ সম্পর্কে একটু চিন্তা করুন। যদি আল্লাহ্‌র নাম 'নূর' তথা 'প্রতিফলিত আলো' হয় তাহলে 'সিরাজ' কী বা কে? হ্যা, পবিত্র কুরআন আমাদের বলেছে কে এই 'সিরাজ'? কিন্তু উত্তরটি আপনাকে আহত করবে। সূরা আহযাবের ৪৫ এবং ৪৬ নং আয়াতে আমরা দেখতে পাই–

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا .

অর্থ : হে নবী (স) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে প্রত্যক্ষদর্শী, সুসংবাদদাতা, ভয় প্রদর্শনকারী এবং আল্লাহর অনুমতিতে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এবং আলোর বিচ্ছুরণকারী প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি।

এখানে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ (স) হচ্ছেন আলোর বিচ্ছুরণকারী একটি প্রদীপ। আরবিতে একে বলে 'সিরাজুম মুনীরা'। শাব্দিক বিশ্লেষণ এবং অভ্যন্তরীণ অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে এখানেই পর্যালোচনাটি শেষ। শাব্দিক দিক দিয়ে 'সিরাজ' এবং বিশ্লেষণ 'মুনীরা' এখানে একত্রে একটি উজ্জ্বল জিনিসকে বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (স)। এটি পরিষ্কার যে, এ আয়াতে 'মুনীর' শব্দের অর্থ 'প্রতিফলিত আলো' নয়। এর অর্থ হচ্ছে 'আলো দানকারী'।

হযরত মুহাম্মদ (স) এর সমসাময়িক জনগণ একথা বুঝতেন যে, চাঁদ আলো দানকারী এবং এ ব্যাপারে তারা সঠিক ছিল। ঠিক একইভাবে হযরত মূসা (আ)–এর সমসাময়িক জনগণও বুঝতে পেরেছিলেন যে, সূর্য বৃহত্তর আলো এবং চন্দ্র ক্ষুদ্রতর আলো এবং এ ব্যাপারটি তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু যদি আপনি আরবি শব্দ 'নূর' এবং 'মুনীর' শব্দ, যার অর্থ 'প্রতিফলিত আলো' ধরেন তাহলে পবিত্র কুরআনের ব্যবহারবিধি অনুসারে মুহাম্মদ (স) হচ্ছেন সূর্যের ন্যায় এবং আল্লাহ্ হচ্ছেন চন্দ্রের ন্যায়। ডা. জাকির নায়েক প্রকৃতপক্ষেই কি একথা বলতে চাচ্ছেন যে, মুহাম্মদ (স) আলোর উৎস এবং আল্লাহ হচ্ছেন তার প্রতিফলন মাত্র? কেন এ ধরনের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক দাবি উত্থাপিত হয়েছে যা কোনো মুসলমানই মেনে নিতে পারে না, যদি সে তার নিজ ধর্মগ্রন্থ কুরআন গভীরভাবে অধ্যয়ন করে।

বাইবেলে পানিচক্র

কিছু মুসলিম লেখক দাবি করেছেন যে, পবিত্র কুরআন পানিচক্রের প্রাক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করেছে। পানিচক্র নিরীক্ষণ করলে আপনি এ চক্রটিতে চারটি স্তর দেখতে পাবেন। প্রথম স্তরটি হচ্ছে বাষ্পীভবন। এ পর্যায়ে পানি সমুদ্র এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বাষ্পীভূত হয়। দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে এটা মেঘে পরিণত হয়। তৃতীয় স্তর এ মেঘমালা থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং চতুর্থ স্তরটি হচ্ছে এ বৃষ্টির কারণে গাছপালা জন্মায়। এই কার্যপ্রকরণগুলো অত্যন্ত সহজবোধ্য এবং প্রত্যেকেই ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ প্রকার সম্পর্কে জানেন। এমনকি যদি কেউ শহরেও বসবাস করেন, তারপরও জনেন যে, মেঘমালা আসার ফলে বৃষ্টিপাত হয় এবং ফুল ফোটে। কিন্তু প্রথম প্রকার সম্পর্কে কি তারা চিন্তা করে দেখেছেন? আমরা এ বিষয়টি ভেবে দেখিনি। এটা অত্যন্ত কঠিন। আর কুরআন প্রথম স্তর সম্পর্কে বর্ণনা করেনি। এখন আমরা বাইবেলে বর্ণিত একজন নবীর ব্যাপারে আলোচনা করব যিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০ সালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি হলেন নবী অ্যামোস। তিনি লিখেছেন, 'তিনি সেই সত্তা যিনি নক্ষত্রপুঞ্জ এবং আদমসুরত নামের নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন, যিনি অন্ধকার থেকে আলোর উদ্ভব ঘটান এবং দিনকে রাতে পরিণত করেন, অতঃপর সমুদ্রের পানিকে তরল করেন।' এটাই প্রথম স্তর। এ পানিকে তিনি ভূ-পৃষ্ঠের ওপর প্রবাহিত করে দেন। তিনি পানির ঐ বিন্দু যা ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী জলীয় বাষ্প থেকে বৃষ্টির ন্যায় ঝরে পড়ে তার দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। এটা তৃতীয় স্তর। এপর মেঘমালার স্তর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। এটা দ্বিতীয় স্তর যাতে আর্দ্রতা এবং প্রচুর পরিমাণ পানির ঝরনা মানুষের ওপর ঝরে পড়ে। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রথম স্তরটি সম্পর্কে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার এক হাজার বছর পূর্বে বর্ণনা করেছে বাইবেল।

জমিনে স্থাপিত পর্বতমালা স্থির ও নিশ্চল

এখন আমরা পর্বতের দিকে দৃষ্টি দেব। পবিত্র কুরআনে এক ডজনের বেশি আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা স্থির এবং নিশ্চল পর্বতমালাকে পৃথিবীর ওপর স্থাপন করেছেন। এসব আয়াতের অধিকাংশ জায়গাতেই পর্বতমালাকে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন হিসেবে অথবা বেঈমানদের সতর্ক করার জন্য বর্ণনা করা হয়েছে। এর একটি উদাহরণ কুরআনের ৩১তম সূরা, সূরায়ে লোকমানের ১০ এবং ১১ নং আয়াতে পাঁচটি সতর্কবাণীর অন্যতম একটি হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ـ

অর্থ : তিনি আকাশকে খুঁটিবিহীন সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা অবলোকন করে থাক আর জমিনে নিশ্চল পর্বতশৃঙ্গ স্থাপন করেছেন, যাতে তা তোমাদের আন্দোলিত না করতে পারে আর চতুষ্পদ প্রাণী তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

সূরা আম্বিয়া'র ৩১নং আয়াতে সাতটি সতর্কবাণীর অন্যতম হিসেবে একটি বাণী উল্লেখ করে বলা হয়েছে–

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ـ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ـ

অর্থ : আর আমি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যাতে তোমাদের আন্দোলিত না করতে পারে এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারে।

পরিশেষে সূরা নাহলের ১৫নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَاَنْهٰرًا وَّسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ـ

অর্থ : আর আমি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যাতে তা তোমাদেরকে আন্দোলিত না করতে পারে এবং স্থাপন করেছি নদ-নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌছতে পার।

আমরা এভাবে দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীদের বলা হয়েছে যে, আল্লাহ এর মাধ্যমে একটি বিরাট কাজ সম্পাদন করেছেন, তিনি পর্বতমালাকে নিশ্চলভাবে স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে কম্পন সৃষ্টি করতে না পারে।

পরবর্তী দুই আয়াতে অন্য দৃশ্যটির অবতারণা করা হয়েছে। সূরা নাবার ৬-৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে– اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ـ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ـ

অর্থ : আমি কি ভূ-পৃষ্ঠকে সম্প্রসারিত করিনি? আর পর্বতমালাকে খুঁটি হিসেবে তৈরি করি নি?

এরপর সূরা গাসিয়ার ১৭-১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ـ وَاِلَى السَّمَاۤءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ـ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ـ

অর্থ : তারা কি উষ্ট্রকে প্রত্যক্ষ করে না তাকে কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? আর আকাশের দিকে– তাকায় না কত উঁচুতে তাকে স্থাপন করা হয়েছে? এবং পর্বতমালার দিকে তাকে কীভাবে স্থাপন করা হয়েছে?

এখানে মানুষকে বলা হয়েছে যে, পর্বতকে স্থাপন করা হয়েছে তাবুর খুঁটির ন্যায় যা তাবুকে স্থির রাখতে সহায়তা করে। সুতরাং পুনরায় এ ধারণাই প্রতিষ্ঠিত হলো যে পর্বতমালাকে পৃথিবীতে স্থাপন করা হয়েছে এমনভাবে যাতে তা কম্পিত হতে না পারে।

তৃতীয় আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে رَوَاسِىَ (রওয়াসিয়া) শব্দটির মাধ্যমে যার অর্থ পর্বতমালা। এ শব্দটি আরবি শব্দ 'আরসা' (اَرْسٰى) আর এই একই শব্দমূলটি 'নোঙর' শব্দটি বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কারণ 'নোঙর' ফেলার মাধ্যমে জাহাজকে একই স্থানে রাখা হয়। আর আল্লাহর বাণী– 'আমি পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যাতে পৃথিবী কম্পন হতে রক্ষা পায়' এ বক্তব্য থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসারীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, পর্বতমালাকে তাঁবুর খুঁটির ন্যায় স্থাপন করা হয়েছে যাতে সে তাঁবুকে টেনে রেখে স্থির রাখতে পারে। যেমনিভাবে নোঙর জাহাজকে একটি নির্দিষ্টস্থানে স্থির করে রাখে ঠিক একইভাবে পর্বতও পৃথিবীকে ভূ-কম্পনের হাত থেকে রক্ষা করে তাকে স্থির করে দেয়। আসলে এ ধারণাটা ভুল। পর্বতমালার গঠনভেদই ভূমিকম্পের কারণ। সুতরাং এসব আয়াত একটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। ড. মরিস বুকাইলি এটা স্বীকার করেছেন এবং বিষয়টি 'The Bible, the Quran and Science' বইতে আলোচনা করেছেন। উপরোল্লিখিত আয়াতগুলো উপস্থাপন করে তিনি বলেছেন, আধুনিক ভূ-তত্ত্ববিদগণ পৃথিবীতে একটি ভুল তথ্য প্রদান করে চলছেন, পর্বতমালার স্থাপন এবং তার মাধ্যমে পৃথিবীর স্থিরতা প্রদান সংক্রান্ত এসব ভুলের গোলকধাঁধা সৃষ্টি করেছে।'

ভূ-তত্ত্বের অধ্যাপক ড. ডেভিড এ. ইয়ংকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'যখন একথা সত্য যে, কিছু কিছু পর্বত ভাঁজ করা শিলাখণ্ডের দ্বারা গঠিত এবং এ ভাঁজের পরিমাণ বেশি আকারে হতে পারে। আর এটা সত্য নয় যে ভাঁজটা স্থির উপরিভাগকে পলস্তার করেছে। ভাঁজের সবচেয়ে বেশি উপস্থিতি দেখা যায় তার উপরিভাগের অস্থিরতার মাধ্যমে।' অন্য কথায় পর্বতমালা পৃথিবীকে কম্পনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না বরং এদের গঠন বা রূপান্তরের কারণেই অতীতে এবং বর্তমানে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে কম্পন অনুভূত হয়।

আধুনিক ভূ-তাত্ত্বিক তত্ত্বসমূহ বলেছে, ভূ-পৃষ্ঠে উপরিভাগের শক্ত অংশকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ এবং স্তর দ্বারা গঠন করা হয়েছে, যেগুলো একটির সাথে অন্যটির সম্পর্ক ও আকার ধারণ ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হয়। মাঝে মাঝে দেখা যায় যে, স্তরগুলোর গঠন একটি থেকে অন্যটি আলাদা। যেমন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ভূ-গঠন ইউরোপ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ভূ-গঠন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আবার মাঝে মাঝে এটাও দেখা যায় যে, ভূ-তত্ত্বের স্তরগুলো একই রকম এবং এরা একের পর এক পিছলে যায় আবার এরা একের পর এক ঝাঁকুনি দিয়ে চলে। আর এভাবে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের পর্বত গঠনের উদাহরণ মধ্যপ্রাচ্যে পাওয়া যায় যেখানে আরবের ভূ-ভাগ ইরানের ভূ-ভাগের দিকে টার্ন করেছে।

যদি কোনো পর্যটক পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে রাস্তা দিয়ে ভ্রমণ করে তাহলে সে দেখতে পাবে, পাহাড়ের পাদদেশের মাটি সমতল ভূমির নিকট থেকে ত্রিভুজাকৃতির ন্যায় উপরে উঠে গেছে। এমন স্থানে শুরুতে ভূমি আনুভূমিক এবং ক্রমান্বয়ে ৭৫ ডিগ্রী উপরে উঠে গেছে। এগুলো ক্রমান্বয়ে নিক্ষেপিত হয় এবং এ কারণেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয় পর্বতমালার গঠনভেদের জন্য। মাঝে মাঝে মাটির স্তরগুলো একটির সাথে অন্যটির ধাক্কা লেগে লাফিয়ে চলা শুরু করে। এ অবস্থায় বড় ধরনের শক্তি সৃষ্টি হয়। যখন এ শক্তির ঘর্ষণ শেষ হয়ে যায়, তখন স্তরের টুকরাটি সেখানে আঘাত হানে, সামনের দিকে একপাশে ছিটকে পড়ে। ভূমিকম্পের কেন্দ্রে এক ধরনের কম্পনের সৃষ্টি হয় এবং হঠাৎ করে এটি হয়ে পড়ে শক্তিহীন।

ভূমিকম্পের সময় সম্প্রতি এটা দেখা গেছে যে, ভূমিকম্পের স্তরটি ৪ মিটার সামনে পড়েছে। যদি আপনার বাড়িটি হঠাৎ করে ৩ মিটার দূরে লাফিয়ে পড়ে, তাহলে সেখানে আকস্মিক ভূমিকম্প বা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। অন্য আরেক ধরনের পর্বতমালা রয়েছে, যেগুলোর গঠন হয়েছে অগ্নিগিরির দ্বারা। লাভা এবং ছাই নির্গত হয়ে উঁচু পর্বতমালা গঠিত হয়। এমনকি সমুদ্রের তলদেশেও এমন পর্বতমালার অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। আর এ ধরনের পর্বতের অস্তিত্ব আমরা বিভিন্ন প্রামাণ্য ছবিতে দেখতে পারি। যেখানে উপমহাদেশীয় প্রান্তিক সীমা শেষ হয়ে মহাদেশীয় প্রান্তীয় সীমা শুরু হয়েছে সেখানে এ ধরনের পর্বতমালা দেখতে পাওয়া যায়। কারণ এসব এলাকায় অগ্নেয়গিরি রয়েছে। এজন্যই এখানে পর্বতমালা গঠন হয়েছে। আর এতে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

উল্লিখিত তথ্যের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, পর্বতমালাকে প্রকৃতপক্ষেই কম্পন এবং ঝাঁকুনি সৃষ্টির জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং আজ অবধি এ একই অবস্থা রয়েছে। আর ভূমিকম্পও পর্বতের গঠনের কারণেই হয়ে থাকে। যখন মাটির একটি স্তর অন্যটির ওপর আছড়ে পড়ে তখনই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। যখন অগ্নেয়গিরি লাভা নিঃসরণ করে, তখনো ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। যা হোক, এটি পরিষ্কার যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারীরা এসব আয়াতের মর্মার্থ বুঝতে পেরেছিলেন আর তাই তারা বলেছিলেন, আল্লাহ পর্বতমালাকে তাঁবুর খুঁটির ন্যায় সৃষ্টি করেছেন, যাতে পৃথিবীকে কম্পনের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। পর্বতমালাকে পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন এটা নিয়ে কবিতা সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু পৃথিবীকে স্থির রাখার জন্য পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে– একথা বলা বেশ কঠিন, যা খাপ খায়না আধুনিক বিজ্ঞানের বক্তব্যের সাথে।

ডা. জাকির নায়েক

কুরআনে বিজ্ঞান সম্পর্কিত আয়াত সহস্রাধিক

এ বিষয়টি আমাদের বিশ্লেষণ করা দরকার যে, কুরআন কি আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নাকি সঙ্গতিপূর্ণ? বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছেন, 'ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান খোঁড়া এবং বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ।' আপনাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, মহিমান্বিত কুরআন কোনো বিজ্ঞানের বই নয়। বরং এটা হচ্ছে চিহ্ন বা ইঙ্গিতের বই। এটা আয়াত বা নিদর্শনের বই। আর এতে ৬০০০-এর অধিক আয়াত রয়েছে যার মধ্য থেকে ১০০০ হাজারের অধিক আয়াতই বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করেছে। কুরআন এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় আমি কেবল বৈজ্ঞানিক এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি বৈজ্ঞানিক সূত্র কিংবা ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করব না। কারণ এসব সূত্র বা ধারণার ভিত্তি হচ্ছে প্রমাণহীন অনুমিতি। এছাড়া আমরা জানি, বিভিন্ন সময় বিজ্ঞান তার নিজের দিকে ফিরে বিপরীত ধারণাকে সত্য হিসেবে প্রমাণ করে।

ড. মুরিস বুকাইলির ইতিহাস এবং বিজ্ঞানের আলোকে রচিত 'বাইবেল ও কোরআন' শীর্ষক বইয়ের জবাব দিয়েছেন ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল। তিনি তার লেখায় বলেছেন, উপস্থাপনার দুটি বিশেষ রীতি রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে সামঞ্জস্যপূর্ণ রীতি, যার অর্থ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যিনি ধর্মগ্রন্থ এবং বিজ্ঞানের মধ্যে সঙ্গতি বিধানের চেষ্টা করেন। অপরটি হচ্ছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ রীতি। যার অর্থ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যিনি ধর্মগ্রন্থ এবং বিজ্ঞানের মধ্যে অসঙ্গতি বিধানের চেষ্টা করেন। খুব ভালোভাবে শেষোক্ত কাজটি সম্পন্ন করেছেন ডা. ক্যাম্পবেল।

তিনি (ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল) অভিযোগ করেছেন যে, পবিত্র কুরআনে বৈজ্ঞানিক ভুল রয়েছে, আর আমি এসব অভিযোগের জবাব দিতে চাই। কিন্তু যেহেতু তিনি প্রথমে বক্তব্য রেখেছেন, তাই আমি আমার আলোচনায় কিছু পয়েন্ট উল্লেখ করতে চাই। আমি তার বক্তৃতার অধিকাংশেরই উত্তর উল্লেখ করতে চাই, বিশেষ করে তার ভ্রূণতত্ত্ব এবং ভূ-তত্ত্ব সম্পর্কিত অভিযোগগুলোর জবাব দিতে চাই। অবশিষ্টগুলোর জবাব দেয়ার জন্য আমি আমার সর্বাত্মক চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আমাকে উভয়টি করতে হবে, আমি বিষয়টির প্রতি অবিচার করতে পারব না। বিষয়টি হচ্ছে-'বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন।' আমি কেবল ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কথা বলবো না।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বাইবেল সম্পর্কে খুব বেশি হলে একটি কিংবা দুটি পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর জবাব আমি দিব ইনশাল্লাহ। যেহেতু বিষয়টির প্রতি আমি সুবিচার করতে চাই। আমি উভয়টি নিয়েই আলোচনা করবো জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে 'পবিত্র কুরআন' এবং 'আধুনিক বিজ্ঞান' যতটা সংশ্লিষ্ট, বিজ্ঞানীরা এবং জ্যোতির্বিদরা কয়েক দশক পূর্বে যেভাবে বিশ্বজগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছিলেন, তখন তারা তখন একে বলেছিলেন 'বিগ ব্যাং'। তখন তারা আরও বলেছিলেন 'প্রাথমিক পর্যায়ে এটি একটি প্রাথমিক নেবুলা ছিল, যা পরবর্তীকালে বিস্তৃতি লাভ করে বিগ ব্যাং-এ পরিণত হয়েছিল।' এভাবে ছায়াপথ' নক্ষত্র সূর্য এবং আমাদের পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। এ তথ্যটি সংক্ষেপে পবিত্র কুরআনের ২১তম সূরা সূরায়ে আম্বিয়ার ৩০ নং আয়াতে উল্লেখ আছে–

اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا .

অর্থ : অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, আকাশ ও পৃথিবী একত্রে ছিল অতঃপর আমি তাদেরকে পৃথক করে দিয়েছি।

তাহলে চিন্তা করুন, এ তথ্যটি বিজ্ঞান আমাদের কাছে কিছুদিন পূর্বে উপস্থাপন করলেও পবিত্র কুরআন কিন্তু তা ১৪০০ বছর পূর্বেই পরিবেশন করেছিল!

পবিত্র কুরআনের বর্ণনা নিশ্চিত করেছে আধুনিক বিজ্ঞান

স্কুল জীবনে আমরা শিখেছিলাম পৃথিবীর গতির চেয়ে সূর্যের গতি স্থির। পৃথিবী এবং চাঁদ নিজ নিজ কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে কিন্তু সূর্য স্থির। যখন আমি কুরআনের একটি আয়াত পড়ি অর্থাৎ সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতটি পড়ি, তখন দেখি যে এতে বলা হয়েছে–

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ . كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ .

অর্থ : তিনিই আল্লাহ, যিনি দিন ও রাত এবং সূর্য ও চাঁদ সৃষ্টি করেছেন। আর এদের প্রত্যেকেই নিজস্ব কক্ষপথে নিজ গতিতে সদা প্রবহমান।

আলহামদুলিল্লাহ, আধুনিক বিজ্ঞান কুরআনের বর্ণনাকে কেবল স্বীকারই করেনি বরং নিশ্চিত করেছে।

Contents

সূর্য ও পৃথিবী পরিভ্রমণ করছে নিজ কক্ষপথে

এ সম্পর্ক যে শব্দটি পবিত্র কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে, يسبحون (ইয়াসবাহুন) যার অর্থ একটি প্রবহমান বস্তুর গতিপথ, যখন এর দ্বারা কোনো সৌরজগতীয় বস্তুকে বোঝাবে, তখন এর অর্থ হবে এটি নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরপাক খাচ্ছে। সুতরাং পবিত্র কুরআন বলেছে 'সূর্য এবং পৃথিবী নিজস্ব কক্ষপথে ঘুরপাক খাচ্ছে।' আজকে আমরা জানতে পেরেছি যে সূর্য প্রায় ২৫ দিনে একবার ঘুরপাক খাচ্ছে। বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইবদিন হুবেল আবিষ্কার করেছেন 'বিশ্বজগৎ ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি লাভ করছে।'

পবিত্র কুরআনে সূরা আযযারিয়াত ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ‎.

অর্থ : আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী।

ক্রমান্বয়ে আয়তনে বৃদ্ধি পাচ্ছে এ বিশ্বজগৎ। আরবি শব্দ 'মুসিউনা' (مُوسِعُونَ) অর্থ হচ্ছে 'প্রসারমান'– প্রসারমান জগৎ। এ ক্ষেত্রে ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল জ্যোতির্বিদ্যার যে বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেন, আমি তার জবাব দিব ইনশাআল্লাহ।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল পানিচক্র সম্পর্কে কয়েকটি কার্যকারণ চিহ্নিত করেছেন। পবিত্র কুরআনে বিস্তৃতভাবে পানিচক্রের বিবরণ রয়েছে। আর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল চারটি স্তরের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পবিত্র কুরআনে একটি আয়াতও নেই, যেখানে বাষ্পীভবন সম্পর্কে বলা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের ৮৬ নং সূরা, আত ত্বারিক এর ১১নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ‎.

অর্থ : আকাশের শপথ, যা বৃষ্টি ধারণ করে।

প্রায় সকল মুফাসসিরগণই বলেছেন, সূরা ত্বারিকের এ আয়াতটি দ্বারা আকাশের ঐ সামঞ্জস্যকে বুঝানো হয়েছে যার দ্বারা তা বারবার বৃষ্টি বর্ষণ করাতে সক্ষম। অর্থাৎ বাষ্পীভবন ক্ষমতাকেই বুঝানো হয়েছে। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল যিনি আরবি জানেন, হয়তো বলবেন– কেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিশেষভাবে বিষয়টি বর্ণনা করলেন না?

আমরা এখন জানব, কেন আল্লাহ তাআলা তা স্বীয় প্রজ্ঞাময় বাণীতে বর্ণনা করলেন না। আজকে আমরা এ সম্পর্কে আরো অধিক তথ্য জানতে পেরেছি। যেমন: ওজোনস্তর, পৃথিবীর উপরিভাগে বায়ুর চাপ, বৃষ্টিপাত আরো কতিপয় উপকারী বিষয় এবং পৃথিবীর শক্তিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, যেগুলো মানবজীবনের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। এটি শুধু বৃষ্টিকেই নয়, বরং (আজকে আমরা জানতে

পেরেছি) এটি টেলিযোগাযোগ, টেলিভিশন, রেডিও প্রভৃতি যন্ত্রের তরঙ্গকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে, যার দ্বারা আমরা টেলিভিশন দেখতে পারি, দূরে বসে অন্যের সাথে যোগাযোগ করতে পারি এবং রেডিও শুনতে পাই। এগুলো ছাড়া আকাশ বহির্জগতের ক্ষতিকর রশ্মিও ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং তাকে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন : সূর্যের ক্ষতিকর বেগুনি রশ্মি (Ultraviolet Ray) আয়োনোস্ফিয়ার কর্তৃক বাধাগ্রস্ত হয়। যদি তা বাধাগ্রস্ত না হতো তা হলে পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ত। সুতরাং আল্লাহ তাআলা অধিক উৎকৃষ্ট এবং অধিক যথার্থ, বাণী নাযিল করেছেন।

আল-কুরআনে পানিচক্র

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে বলেছেন, প্রথমটি হচ্ছে, তার মতে বাষ্পীভবন, যার সাথে আমরা একমত পোষণ করি। আমরা বাইবেলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রীতির ব্যাপারে মনোক্ষুণ্ন নই; যেখানে বলা হয়েছে– 'বৃষ্টি পতিত হয় এবং অতঃপর মেঘমালা গঠিত হয়।'

এটা কিন্তু পরিপূর্ণ পানিচক্রের বর্ণনা নয়। আলহামদুল্লিাহ, পবিত্র কুরআন বেশ কয়েকটি জায়গায় পানিচক্রের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছে। এতে বলা হয়েছে কীভাবে পানি উপরে ওঠে, বাষ্পীভূত হয়, এবং মেঘের রূপ ধারণ করে এবং মেঘগুলো এক্ষেত্রে ভেসে চলে, এতে কীভাবে গর্জন এবং বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়, পানি নেমে আসে, মেঘমালা সীমান্তপানে ভেসে চলে, তারা বৃষ্টির আকারে নেমে আসে, রংধনু সৃষ্টি হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। আপনাদের জানাতে চাই– পবিত্র কুরআনে পানিচক্রের বিবরণ দেয়া হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে :

১. ৭ম সূরা আ'রাফ এর ৫৭তম আয়াত;
২. ১৩তম সূরা রা'দ এর ১৭তম আয়াত;
৩. ১৫তম সূরা হিজর এর ২২তম আয়াত;
৪. ২৩তম সূরা মুমিনুন এর ১৮তম আয়াত;
৫. ২৪তম সূরা নূহ এর ৪৩তম আয়াত,
৬. ২৫তম সূরা ফোরক্বান এর ৪৮তম আয়াত;
৭. ৩০তম সূরা রূম এর ২৪তম আয়াত;
৮. ৩০তম সূরা রূম এর ৪৮তম আয়াত;
৯. ৩৫তম সূরা ফাতির এর ৯ম আয়াত,
১০. ৩৬তম সূরা ইয়াসীন এর ৩৪তম আয়াত;
১১. ৩৯তম সূরা যুমার এর ২১তম আয়াত;

১২. ৪৫তম সূরা জাসিয়া এর ৫ম আয়াত;

১৩. ৫০তম সূরা ক্বাহাফ এর ৯ম আয়াত;

১৪. ৫৬তম সূরা ওয়াক্বিয়া এর ৬৮ ও ৭০তম আয়াত;

১৫. ৬৭তম সূরা, মুলক এর ৩০তম আয়াত।

ভ্রূণতত্ত্ব আলোচনা নিয়ে ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তার অধিক সময়ই ব্যয় করেছেন। অল্প কিছু আলোচনা ভূ-তত্ত্ব সম্পর্কিত বিষয়ে এবং এ বিষয়ে ৬টি বিষয় স্পর্শ করেছেন মাত্র, যেগুলো আমি লিখে এনেছি। ভূ-তত্ত্বের আলোচনায় আমরা ভূ-তত্ত্ববিদদের নিকট থেকে জানতে পেরেছি যে, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৩,৭৫০ মাইল এবং এর ভূগর্ভস্থ অংশ উষ্ণ ও তরল এবং এতে জীবন বাঁচতে পারে না। এছাড়া ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ শক্ত, যার ওপর আমরা বসবাস করি আর এ অংশ খুবই পাতলা, ১ থেকে ৩০ মাইলের মতো। কিছু অংশ এর চেয়েও পাতলা, তবে অধিকাংশই ১ থেকে ৩০ মাইলের মতো পুরু। যেখানে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগ অপেক্ষাকৃত কম পাতলা সেখানে ভূ-কম্পন সৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে 'ভাঁজতত্ত্ব'। আর এ তত্ত্বের কারণে কোথাও কোথাও পাহাড়ের সৃষ্টি হচ্ছে, যার ফলে পৃথিবী রয়েছে স্থির–

পাহাড় পৃথিবীর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রথিত

পবিত্র কুরআনের সূরা নাবা এর ৬-৭ নং আয়াতে উল্লেখ আছে,

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ـ

অর্থ : আমি কি পৃথিবীকে বিছানারূপে এবং পাহাড়কে পেরেক হিসেবে সৃষ্টি করিনি?

আরবি শব্দ "اوتادا"-এর অর্থ হচ্ছে পেরেকসমূহ অর্থাৎ তাবুর খুঁটি। আর আজকে আমরা আধুনিক ভূ-তত্ত্ব পাঠ করে জানতে পারি যে, পাহাড়ের মূল মাটির অনেক গভীরে। এটা ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জানা গেছে। আর পাহাড়ের যে উপরিভাগ আমরা দেখতে পাই, তা পাহাড়ের ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। গভীরের অংশ অনেক বড়, ঠিক যেভাবে একটি পেরেকের অধিকাংশই মাটির গভীরে প্রোথিত হয়। তাহলে আয়াতে উল্লিখিত পাহাড়গুলোকে খুঁটি হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে একথা পবিত্র কুরআন বলেনি।

আপনি মাথার অংশটুকুই দেখতে পান আর অধিকাংশই মাটির নিচে গাঁথা থাকে, যেমন : শিলাখণ্ড। আপনি দেখবেন, বরফের শিলাখণ্ডের ৯০%ই পানির নিচে থাকে, কেবল ১০% পানির উপরে থাকে। পবিত্র কুরআনে সূরা নাযিয়াত এর ৩২নং আয়াতে বলা হয়েছে– وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ـ

অর্থ : আর তিনি পাহাড়কে পৃথিবীর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন।

সূরা গাশিয়া এর ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ـ

অর্থ : (তারা কি লক্ষ্য করে না) পাহাড়ের দিকে যে, কিভাবে তা স্থাপন করা হয়েছে?

বর্তমানে আধুনিক ভূ-তত্ত্বের ব্যাপক উন্নতির পর ১৯৬০ সালে প্লেটেকটনিস এর তত্ত্বের উদ্ধৃতি দিয়ে ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেছেন, 'এটা প্রমাণিত হয়েছে যে পাহাড়ের এলাকার উচ্চতা বৃদ্ধি পায়।' আর আজকের ভূ-তত্ত্ববিদরা বলছেন, পাহাড়গুলো পৃথিবীর স্থিরতা বৃদ্ধি করে। সকল ভূ-তত্ত্ববিদ এ দাবি করেননি, কেউ কেউ একথা বলেছেন। তবে আমি ভূগোলের ছাত্র না হয়েও চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল একটি মাত্র বই পড়ে তা থেকেই জবাব দিতে চেষ্টা করেছেন। এটা জনৈক ভূগোলবিদের মতামত মাত্র। আর তাই এটা কোনো গুরুত্ব বহন করে না। তার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল ডা. কেইথ মুরের সঙ্গে, এটা প্রমাণিত। আর আপনি যদি The Earth (পৃথিবী) নামক বইটি পড়েন, যে বইটির অন্যতম একজন লেখক হলেন ডা. ফ্রাঙ্ক প্রেস, যিনি মার্কিন সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের একজন উপদেষ্টা ছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সায়েন্স একাডেমির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি তার বইতে লিখেছেন, 'পাহাড়গুলোর মূল অনেক গভীরে প্রোথিত।' তিনি আরো বলেছেন, 'পাহাড়ের কাজ হচ্ছে পৃথিবীকে স্থির করা।' আর পবিত্র কুরআন সূরা আম্বিয়া-এর ৩১নং আয়াত; সূরা লোকমান এর ১০ নং আয়াত এবং সূরা নাহল এর ১৫নং আয়াতে ঘোষণা করেছে–

وَجَعَلْنَا فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ ـ

অর্থ : আমি জমিনে পাহাড়সমূহ সৃষ্টি করেছি, যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঢলে না পড়ে।

পাহাড় ভূমিকম্প রোধ করে– কুরআন বলেনি

পবিত্র কুরআনে পাহাড়ের কাজ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটা পৃথিবীকে ঢলে পড়া থেকে রক্ষা করে। কুরআন কোথাও বলেনি যে পাহাড়সমূহ ভূমিকম্পরোধ করে। আর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেছেন, এমনকি তিনি তার বইয়ে লিখেছেন এবং আলোচনায় বলেছেন, আপনি দেখতে পাবেন যে, পাহাড়ি এলাকায়ও বিভিন্ন সময় ভূ-কম্পন হয় এবং পাহাড়গুলোই ভূমিকম্পের কারণ। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি উল্লেখ করা দরকার তা হচ্ছে কুরআন কোথাও বলেনি পাহাড়গুলো ভূমিকম্প রোধ করে। ভূমিকম্পের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে زلزال (যিলযাল) বা زَلْزَلَةٌ (যালযালাহ) যে সম্পর্কে ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল জানেন। কিন্তু উপরে উল্লিখিত তিনটি আয়াতেই যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে تَمِيْدَ (তামিদ) যার অর্থ হচ্ছে ঝাঁকুনি দেয়া, হেলে পড়া বা ঢলে পড়া। আল কুরআনে সূরা লোকমানের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন– وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ ـ

অর্থ : আমি পৃথিবীতে পাহাড়সমূহ স্থাপন করেছি, যেন পৃথিবী তোমাদের নিয়ে ঢলে না পড়ে)

এ বর্ণনা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, যদি পৃথিবীতে পাহাড় না থাকত, আর তুমি যদি তাতে চলাফেরা করতে তাহলে পৃথিবী তোমাদের নিয়ে ঢলে পড়তো– যদি তুমি আন্দোলিত করতে, তাহলে পৃথিবী তোমাকে নিয়ে আন্দোলিত করতো। আর আমরা জানি যে, স্বাভাবিকভাবেই আমরা যখন পৃথিবীতে হাঁটি, এটা ঢলে পড়ে না। না ঢলে পড়ার কারণ সম্পর্কে ডা. ফ্রাঙ্ক প্রেস এবং সৌদি আরবের বিখ্যাত ভূগোল লেখক ডা. নাজ্জাত একই বর্ণনা দিয়েছেন। ডা. নাজ্জাত একটি বই লিখেছেন, যাতে তিনি পবিত্র কুরআনের ভূ-তত্ত্ব সম্পর্কিত ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের যতগুলো অভিযোগ আছে সবগুলোরই জবাব দিয়েছেন। আর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তার বইতে লিখেছেন– যদি পাহাড়গুলো ভূমিকম্পকে রোধ করে, তাহলে আপনি কীভাবে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিকম্প হতে দেখেন।'

আমি বলেছিলাম, পবিত্র কুরআন কোথাও বলেনি পাহাড়গুলো ভূমিকম্পকে রোধ করে। ভূমিকম্পের সংজ্ঞাটি দেখেন, তাহলে দেখবেন এটি বলছে "ভূমিকম্পের কারণ হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের শক্ত আবরণের বিধ্বংসী আলোড়ন।" পবিত্র কুরআনও زِلْزَال (ভূমিকম্প) সম্পর্কে সূরা যিলযালের ১নং আয়াতে বলেছে–

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا -

অর্থ : পৃথিবীকে যখন প্রকম্পিত করা হবে প্রবলভাবে প্রকম্পনের ন্যায়।

কিন্তু এখানে বলা হয়েছে تَمِيْدَ بِكُمْ অর্থাৎ 'পৃথিবীকে তোমাদের নিয়ে ঢলে পড়া থেকে বিরত রাখার জন্য'। আর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের কথা 'পাহাড় যদি ভূমিকম্প রোধ করে, তাহলে আপনি কীভাবে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিকম্প হতে দেখেন'– এর জবাবে আমি বলতে চাই– যদি আমি বলি যে, মেডিক্যাল ডাক্তার মানুষের রোগ ও অসুস্থতা প্রতিরোধ করে। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, তাহলে আপনি কীভাবে অধিক পরিমাণে অসুস্থ ও রোগীকে হাসপাতালে দেখতে পান যেখানে বাড়ির চেয়ে অধিক সংখ্যক ডাক্তার থাকে?'

সমুদ্রবিদ্যার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনে সূরা আল ফুরকান এর ৫৩ নম্বর আয়াতে বলেছে–

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا -

অর্থ : তিনি সেই সত্তা যিনি দুটি দরিয়া প্রবাহিত করেছেন যার একটি হচ্ছে স্বাদু এবং অপরটি হচ্ছে লবণাক্ত দরিয়া খর, যদিও তারা মিলিত হয় কিন্তু তাদের পানি

একে অপরের সাথে মিশ্রিত হয় না। আর উভয়ের মাঝে তিনি একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন, যা অতিক্রম করা যায় না।

পবিত্র কুরআনে সূরা আর রাহমানের ১৯ ও ২০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ - بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ -

অর্থ ঃ তিনিই আল্লাহ যিনি দুটি পানির ধারা প্রবাহিত করেছেন। যদিও এরা প্রবাহিত হয় কিন্তু এদের পানি একটি অপরটির সাথে মিশ্রিত হয় না। উভয়ের মাঝে এক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যা অনতিক্রম্য।

'বারযাখ' অদৃশ্য প্রতিবন্ধক

পবিত্র কুরআনের তাফসীরকারকগণ অতীতে বিস্মিত হয়েছিলেন একথা ভেবে যে কুরআন কী বোঝাতে চাচ্ছে? আমরা মিঠা পানি ও লবণাক্ত পানি সম্পর্কে জানি, কিন্তু এদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যদিও তারা মিলিত হয়। কিন্তু তাদের পানি একে অপরের সাথে মিশ্রিত হয় না। বর্তমানে সমুদ্র বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতির পর আমরা জানতে পেরেছি যে, যখন এক ধরনের পানি অপর ধরনের পানির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন এটা নিজস্ব উপাদান হারিয়ে ফেলে এবং যে পানির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তার সাথে একাকার হয়ে যায়। এখানে এমন একটি ঢালু এলাকা রয়েছে, যেখানে উভয় পানি একাকার হয়ে যায়। আর পবিত্র কুরআন এটাকেই 'বারযাখ' বা অদৃশ্য প্রতিবন্ধক বলে অভিহিত করেছে। অনেক বিজ্ঞানীই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন, এদের মধ্যে আমেরিকার সমুদ্রবিজ্ঞানী ডা. হেইও রয়েছেন।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তার বইয়ে লিখেছেন এটি একটি পর্যবেক্ষণমূলক বিষয়। তৎকালীন জেলেরা জানত যে দু'ধরনের পানি রয়েছে, মিঠা ও লবণাক্ত। আর নবী মুহাম্মদ (স) সিরিয়া ভ্রমণের সময় সমুদ্র ভ্রমণে গিয়েছিলেন অথবা ঐসব জেলেদের সাথে আলাপ করে এসব তথ্য জানতে পেরেছিলেন বস্তুত মিঠা এবং লবণাক্ত পানি একটি পর্যবেক্ষণমূলক ধারণা, এসব কথার সাথে আমি একমত। কিন্তু লোকেরা জানত না যে সেখানে এক ধরনের অদৃশ্য প্রতিবন্ধক রয়েছে, এমনকি এখনো অনেকে এটা জানে না। এখানে যে বৈজ্ঞানিক বিষয়টি মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে 'বারযাখ' বলতে মিঠা এবং লবণাক্ত পানিকে বোঝায় না।

Contents

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল ভ্রূণতত্ত্বের ব্যাপারে তার আলোচনার প্রায় অর্ধেকটা সময় ব্যয় করেছেন। সময়ের সংক্ষিপ্ততার কারণে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের জবাব দেয়া সম্ভব হবে না যেসব বিষয় একান্তই অযৌক্তিক। আমি সংক্ষেপে এর জবাব দেব, যা সন্তোষজনক হবে ইনশাআল্লাহ। আর অধিক বিস্তারিত বিবরণের জন্য আপনারা আমার ভিডিও ক্যাসেটটি দেখতে পারেন 'কুরআন এবং আধুনিক বিজ্ঞান' এবং অন্য আরও একটি ভিডিও ক্যাসেট– 'কুরআন এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান।'

কুরআন ও হাদিস ভ্রূণতত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ

এক শ্রেণীর আরব পণ্ডিত পবিত্র কুরআনে ভ্রূণতত্ত্ব সম্পর্কিত যেসব তথ্য প্রদান করা হয়েছে তা সংগ্রহ করেছেন। তারা এ সম্পর্কিত হাদিসগুলোও সংগ্রহ করেছেন। এরপর তারা ঐসব তথ্য প্রফেসর কেইথ মূরের নিকট উপস্থাপন করেছেন। প্রফেসর কেইথ মূর কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান। তিনি ভ্রূণতত্ত্বের ব্যাপারে একজন নামকরা বিজ্ঞানী। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন অনুবাদ পড়ার পর তাকে এ ব্যাপারে মন্তব্য করার জন্য বলা হলে তিনি বলেছিলেন, 'পবিত্র কুরআন এবং হাদিসের অধিকাংশ ভাষ্যই আধুনিক ভ্রূণ বিদ্যার বক্তব্যের সাথে যথাযথভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ।' তবে এমন কিছু ভাষ্য রয়েছে যেগুলোকে আমি সঠিক বলতে চাই না, আবার এগুলোকে ভুলও বলতে চাই না। কারণ আমি নিজেই এ সম্পর্কে জানি না। আর প্রথম নাযিলকৃত ৯৬তম সূরা আলাক এর ১ এবং ২ নং আয়াত, যেখানে বলা হয়েছে–

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ -

অর্থ : পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের বক্তৃতা প্রসঙ্গে 'আলাক' শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণে আমাদের দেখতে হবে অবতীর্ণ হওয়ার সময় এর কী অর্থ ছিল কিংবা তখন এর কী অর্থ ছিল যখন এ বইটি লেখা হয়েছিল। আর তিনি যথার্থভাবেই বলেছিলেন যে, শব্দটির সঠিক অর্থ বিশ্লেষণ করতে চাইলে এ শব্দটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় এবং তৎকালীন জনগণ শব্দটি দ্বারা কী বুঝেছিল তা জানা দরকার।

ম্যাথিউ রচিত গসপেলের ১০ম অধ্যায়ের ৫ এবং ৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যিশুখ্রিস্ট তাঁর অনুসারীদের বলেছেন, 'ইহুদি নয় এমন ব্যক্তির নিকট যেও না।'

ইহুদি নয় এমন ব্যক্তি কারা? এরা হচ্ছে ইহুদি ব্যতীত হিন্দু, মুসলমান। এখানে আরো বলা হয়েছে– 'বরং তোমরা ইসরাঈলীদের বাড়ির হারানো মেষের নিকট যাও।' ম্যাথিউ রচিত গসপেলের ১৫তম অধ্যায়ের ২৪ নং অনুচ্ছেদে যিশুখ্রিস্ট বলেছেন, 'আমি প্রেরিত হইনি'। সুতরাং যিশুখ্রিস্ট এবং বাইবেল কেবল ইসরাইলি শিশুদের দ্বারা বোধগম্য করা সম্ভব ছিল। যেহেতু এটা বাইবেল দ্বারাই বোঝা সম্ভব ছিল। সুতরাং আপনি সেসব শব্দার্থই ব্যবহার করবেন যেগুলো ঐ সময় তারা ব্যবহার করত। কিন্তু কুরআন শুধু তৎকালীন আরবের কিংবা শুধু মুসলমানদের দ্বারাই নয়, পবিত্র কুরআন সমগ্র মানবজাতি এবং সর্বকালেই উপলব্ধি করা সহজ। আর মহানবী (স) শুধু মুসলমানদের কিংবা আরববাসীদের নিকট প্রেরিত হননি। মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতে বলেছেন–

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ -

অর্থ : আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।

কুরআনের সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, আপনি কুরআনের আয়াতের অর্থকে শুধু ঐ সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ করতে পারেন না। কারণ এর অর্থ সর্বকালের জন্যে প্রযোজ্য। সুতরাং 'আলাক' শব্দের অর্থ মাংসপিণ্ড কিংবা এমন বস্তু যা ঝুলন্ত থাকে। এজন্য প্রফেসর কেইথ মূর বলেছেন, 'আমি জানি না যে প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্রূণ মাংসপিণ্ডের ন্যায় থাকে কি-না।' আর তিনি তার পরীক্ষাগারে গেলেন এবং একটি ভ্রূণের প্রাথমিক পর্যায়টিকে মাইক্রোস্কোপ দ্বারা বিশ্লেষণ করলেন, অতঃপর তাকে মাংসপিণ্ডের ছবির সাথে তুলনা করে দেখলেন। হুবহু মিল দেখতে পেয়ে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। এটি হচ্ছে মাংসপিণ্ডের ছবি এবং মানব ভ্রূণ। ড. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল আপনাদের যা দেখিয়েছেন তা হচ্ছে এর অন্য একটি উদ্দেশ্য। আমি যদি আপনাদের এ বইটি দেখাই, তাহলে দেখবেন যে এটা দেখতে একটি ত্রিভুজাকৃতির। যদি আমি আপনাদের এটি দেখাই, তাহলে এটির একটি ভিন্ন উদ্দেশ্য দেখতে পাবেন। ঐ চিত্রটি আপনারা যে আলোকচিত্রে দেখেছেন তাতে দেয়া আছে, আর আমি ঐ ব্যাপারে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রফেসর কেইথ মূরকে ৮০টি প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি বলেন, 'যদি আপনারা আমাকে ৩০ বছর পূর্বে এ ৮০টি প্রশ্ন করতেন, তাহলে আমি ৫০%-এর অধিক প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম হতাম না। কারণ ভ্রূণবিজ্ঞান ৩০ বছর পূর্বে মাত্র উন্নতি লাভ করেছে।' তিনি এটি আশির দশকে বলেছিলেন। এখন আমরা কী প্রফেসর কেইথ মূরের বক্তব্যকে বিশ্বাস করি। তাঁর ভিডিও ক্যাসেটটি এখন সর্বত্র পাওয়া যায়। 'এটাই সত্য' ভিডিওকৃত বিবরণ।

Contents

আল্লাহ্ নিজস্ব আলোর প্রতিফলন ঘটান

পবিত্র কুরআনে সূরা, ফোরক্বানের ৬১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ـ

অর্থ : পবিত্র সেই সত্তা যিনি আকাশে গ্রহপুঞ্জ স্থাপন করেছেন, সেখানে তিনি সূর্য ও দীপ্তিময় চন্দ্র স্থাপন করেছেন।

সূর্য এবং চাঁদ উভয়েরই ধার করা আলো– মুনীর। চাঁদকে বোঝাতে আরবিতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে 'ক্বামার' قَمَر। 'মুনীর' বা 'নূর' শব্দটি সর্বদাই প্রতিফলিত আলো অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'সূর্য'কে বোঝাতে আরবিতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তা হচ্ছে 'শামস' (شَمْس)। 'ওহাদ' বা 'দিয়া' শব্দটি সর্বদাই একটি উজ্জ্বল বাতি অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আর এ ব্যাপারে আমি পবিত্র কুরআনের অন্যান্য আয়াতের উদ্ধৃতি দিতে পারি। ক্যাম্পবেল বলেছেন, যদি এর অর্থ 'প্রতিফলিত আলো' তাহলে তিনি সূরা আল নূর এর ৩৫ ও ৩৬ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিবেন যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হচ্ছে نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ 'আসমান ও জমিনের নূর।' সম্পূর্ণ আয়াতটি পড়ুন এবং বিশ্লেষণ করুন এটা কী বলছে। এ আয়াত বলছে 'আল্লাহ্ হচ্ছেন আসমান ও জমিনের নূর।'

এর অর্থ এ রকম যেমন চেরাগদানি এবং চেরাগদানিতে একটি বাতি। 'বাতি' শব্দটি সেখানে ছিল। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা নিজের থেকেই আলো পেয়েছেন, আর এমনকি প্রতিফলিত আলোও। বাতির অভ্যন্তরটা যেন একটি 'সিরাজ' কিন্তু প্রতিফলনকারী যেন চাঁদ। এটা আলোর প্রতিফলনকারী। বাতির নিজস্ব আলো রয়েছে কিন্তু প্রতিফলনকারী বাতি আলোর প্রতিফলন করে– এভাবে, দুটিই একটির ভেতরে। সুতরাং কুরআনের ভাষ্য অনুসারে আল্লাহ্র নিজস্ব আলো রয়েছে। আর আল্লাহ্ তাঁর নিজস্ব আলোর প্রতিফলন ঘটান নিজ স্বভাবেই। উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেছেন, কুরআন বলেছে, 'কুরআন হচ্ছে নূর' এটা প্রতিফলিত আলো। অবশ্যই, কুরআন হচ্ছে আলোর প্রতিফলন এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পথ নির্দেশিকা।

মুহাম্মদ (স) 'নূর' ও 'সিরাজ'

হযরত মুহাম্মদ (স) এর সিরাজ হওয়া প্রসঙ্গে বলা যায়, হ্যাঁ, তিনি সিরাজ। মহানবী (স) এর হাদিস এ ব্যাপারে আমাদের পথপ্রদর্শন করেছে। সুতরাং মুহাম্মদ (স) হচ্ছেন 'নূর' এবং একই সাথে 'সিরাজ'ও, আলহামদুলিল্লাহ। তাঁর নিজের জ্ঞানও ছিল। মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকেও তিনি হিদায়াত লাভ করেছেন। সুতরাং আপনি

যদি 'নূর' শব্দটি ব্যবহার করেন এবং 'মুনীর' শব্দটিকে 'প্রতিফলিত আলো' অর্থে ব্যবহার করেন, তাহলে আপনি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে পারবেন যে, চাঁদের আলো এর নিজস্ব নয়, এটা প্রতিফলিত আলো।

আর অন্য যে বিষয়টি ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল উত্থাপন করেছেন তা হচ্ছে পবিত্র কুরআনের সূরা কাহাফের ৮৬ নং আয়াত প্রসঙ্গে। আয়াতটি হচ্ছে– 'জুলকারনাইন সূর্যকে তমসাচ্ছন্ন পানির গভীরে অস্ত যেতে দেখেছেন– যে পানি ছিল কর্দমাক্ত। চিন্তা করে দেখুন, সূর্য ঘোলাটে পানিতে অস্ত যায় যা অবৈজ্ঞানিক। এখানে যে আরবি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে وجد, 'ওয়াজাদা' যার অর্থ হচ্ছে "যুলকারনাইন পেল"। উইলিয়াম ক্যাম্পবেল আরবি জানেন। সুতরাং আপনি যদি وجد, শব্দটির অর্থ অভিধানে যদি দেখেন তাহলে দেখতে পারেন, এর অর্থ 'সে পেল'। অতএব আল্লাহ্ তাআলা এখানে 'যুলকারনাইন যা পেল' তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন।

আমি যদি বলি 'শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বলল ২+২=৫।' এখন আপনারা যদি বলেন, ডা. জাকির নায়েক বলেছেন ২+২=৫। অথচ আমি তা বলিনি। আমি বলেছি "শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বলল যে, ২+২=৫।" আমি ভুল করিনি– ভুল করেছে শিক্ষার্থীরা। আলোচ্য আয়াতটির ব্যাখ্যা করার জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে এরকম– মোহাম্মদ আসাদের মতে, وجد, অর্থ হচ্ছে– 'পাওয়া' অর্থাৎ, 'যুলকারনাইন পেল'। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে যে আরবি শব্দ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তা হচ্ছে 'مغرب' এ শব্দটি 'স্থান' ও 'সময়' উভয়কে বোঝাতেই ব্যবহৃত হয়। যখন আমরা সূর্যাস্তের কথা বলি তখন এর অর্থ 'সময়' ধরতে হবে। যদি আমি বলি, 'সূর্য সন্ধ্যা ৭.০০ টায় অস্ত যায়।' তাহলে আমি এখানে 'সময়' অর্থে ব্যবহার করছি। আবার যদি আমি বলি, সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যায়'। এর অর্থ আমি এখানে শব্দটিকে 'স্থান' অর্থে ব্যবহার করছি। সুতরাং এখানে যদি আমি مغرب শব্দটিকে 'সময়' অর্থে ব্যবহার করি তাহলে যুলকারনাইন সূর্যাস্তের জায়গায় পৌঁছতে পারেননি। তাহলে এর অর্থ হবে– তিনি সূর্যাস্তের সময় পৌঁছেছিলেন। সমস্যাটির সমাধান হয়ে গেল।

আপনারা এ সমস্যাটির সমাধান বিভিন্নভাবে করতে পারেন। এমনকি যদি তা ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেন "না, না, এক্ষেত্রে মৌলিক ধারণাটি সঠিক নয়। এর অর্থ 'পাওয়া' নয়। আমাদের শব্দটির অর্থ বুঝতে বিশ্লেষণ করা দরকার। কুরআনের আয়াত বলছে, 'সূর্য ময়লাযুক্ত পানিতে অস্ত গেল।' এখন আমরা জানি, যখন আমরা এসব শব্দ ব্যবহার করি, যেমন 'সূর্যোদয়' এবং 'সূর্যাস্ত'। আচ্ছা,-সূর্য

কি উদিত হয়? আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে জানি যে, সূর্য উদয় হয় না, আবার সূর্য অস্তও যায় না। আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে এও জানি সূর্য আদৌ অস্ত যায় না। এটা হচ্ছে পৃথিবীর ঘুরপাক খাওয়ার ফল। যার প্রেক্ষিতে সূর্য উদয় হয় কিংবা অস্ত যায় বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আপনারা যদি প্রাত্যহিক খবরের কাগজ পড়েন, তাহলে দেখবেন, এতে লেখা আছে– সূর্যোদয় সকাল ৬.০০টা এবং সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৭.০০টা। তাহলে কি সংবাদপত্র ভুল–অবৈজ্ঞানিক! যদি আমি 'দুর্ঘটনা' শব্দটির ব্যবহার করে বলি, 'দুর্ঘটনা' অর্থ হচ্ছে কোনো না কোনো সংঘটিত দুর্বোধ্যতা। ব্যবহারিক অর্থে 'দুর্ঘটনা' বলতে বোঝায় 'একটি মন্দ তারকা।' অবশ্যই আমি এ শব্দের দ্বারা মন্দ তারকাকে বোঝাতে চাচ্ছি না।

আমি এবং ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল উভয়েই জানি, যখন একজন লোক পাগল হয়, তখন আমরা তাকে বলি মানসিক রোগী। অন্ততপক্ষে, আমি তাই বলি এবং সেটাই বিশ্বাস করি। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলও সেটাই বিশ্বাস করে থাকবেন। আমরা একজন মানসিক ভারসাম্যহীন লোককে মানসিক রোগী বলে অভিহিত করি। এখন 'মানসিক রোগী' বলতে আমরা কি বুঝি 'চাঁদ কর্তৃক আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া'। কিন্তু এ শব্দটি কীভাবে 'মানসিক রোগী' অর্থে ব্যবহৃত হয়? একইভাবে, 'সূর্যোদয়' শব্দটি শুধু ব্যবহারিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর আল্লাহ তাআলাও মানুষের জন্যে পথনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি এমনভাবে শব্দের ব্যবহার করেছেন, যাতে আমরা তা বুঝতে পারি। সুতরাং 'সূর্যাস্ত' দ্বারা প্রকৃতপক্ষে অস্ত যাওয়াকে বুঝায় না– আর সূর্য প্রকৃতপক্ষেই উদিত হয় না। এভাবে ব্যাখ্যাটি পরিষ্কার চিত্র অঙ্কন করতে পেরেছে। সুতরাং পবিত্র কুরআনের সূরা কাহাফের ৮৬ নং আয়াতটি প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

কুরআনের একটি আয়াতও প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের বিপরীত নয়

কুরআন কোথাও বলেনি যে সোলাইমান (আ) একটি লাঠির সাথে দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্রামে ছিলেন। হতে পারে হযরত সোলাইমান (আ) মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন এবং কোনো প্রাণী লাঠিটিকে ঝাঁকুনি দিয়েছিল– আর তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আমি মনে করি যে আমি পবিত্র কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণতার নীতি আলোচনা করছি। কারণ আপনি সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি কিংবা অসামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি যা-ই ব্যবহার করেন না কেন সবই এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

আমার বক্তৃতার শুরুতে আমি পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছি, যেখানে বলা হয়েছে–

Contents

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ـ

অর্থ : তারা কি মনোযোগের সাথে কুরআন অধ্যয়ন করে না? এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট থেকে অবতীর্ণ হতো তবে তারা তাতে অনেক অসংগতি দেখতে পেত।

সামঞ্জস্যপূর্ণ রীতি কিংবা অসামঞ্জস্যপূর্ণ রীতি যে রীতিই ব্যবহার করুন না কেন– তা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। যদি আপনারা যৌক্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তাহলে দেখবেন যে, পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও পাবেন না যা প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানের বিপরীত।

'ইলমে গায়িব' তথা অদৃশ্যের জ্ঞান জ্বিনদের নেই

আমরা জানি, লাঠিতে হেলান দিয়ে হযরত সোলাইমান (আ) দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান করেছিলেন। এ বক্তব্যে ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের সাথে আমি একমত। আমরা এও জানি পরে সোলাইমান (আ) পড়ে গিয়েছিলেন। তখন জ্বিনরা বললো, 'যদি আমরা জানতে পারতাম যে সোলাইমান (আ) ইন্তিকাল করেছিলেন, তাহলে আমাদের এতো কঠিন পরিশ্রম করতে হতো না।' একথা আমাদের নির্দেশনা দিচ্ছে যে, জ্বিনদের নিকট 'ইলমে গায়েব' তথা অদৃশ্যের জ্ঞান ছিল না। কারণ জ্বিনরা দম্ভ করেছিল। তাই আল্লাহ তাদের বুঝিয়ে দিলেন যে তাদের 'অদৃশ্যের জ্ঞান' নেই।

দুধ উৎপাদন ও তার ব্যবহার সম্পর্কে কুরআন

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় যেসব খাবার আমরা খাই, তা প্রথমে অন্ত্রে চলে যায় এবং অন্ত্রে খাদ্য থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন উপাদানগুলো রক্ত প্রবাহের সাথে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে চলে যায়। কখনো কখনো লিভারের পোর্টাল পদ্ধতির মাধ্যমে ম্যামারি গ্লান্ডে বা দুগ্ধগ্রন্থিতে পৌঁছে যায়। এরই ফলে দুধ উৎপন্ন হয়ে থাকে। আর পবিত্র কুরআন আধুনিক বিজ্ঞানের এ তথ্যটি সংক্ষিপ্তাকারে সূরা নাহলের ৬৬নং আয়াতে প্রদান করেছে। যেমন,

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ـ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا

خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ـ

অর্থ : আর নিশ্চয়ই চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে তোমাদের জন্যে শিক্ষণীয় রয়েছে, আমি তোমাদের পান করাই তা থেকে যা তাদের রক্ত এবং অন্ত্র থেকে বিশুদ্ধ দুধের আকারে বেরিয়ে আসে। তা পানকারীদের তৃষ্ণা নিবারণ করে।

'দুধ উৎপাদন' শীর্ষক আলোচনা সম্পর্কে ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল কুরআনের সূরা নাহলের ৬৬ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। রক্তের সঞ্চালন গতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম যিনি বলেছিলেন তিনি হচ্ছেন ইবনে নাফীস। তিনি কুরআন নাযিলের ৬০০ বছর পরে এ ঘোষণা দিয়েছিলেন। ইবনে নাফীসের ৪০০ বছর পরে উইলিয়াম হার্ভে পাশ্চাত্যে এ সাধারণ ঘোষণাটি প্রথম দিয়েছিলেন– যেটা ছিল কুরআন নাযিলের ১০০০ বছর পরের ঘটনা।

আলহামদুলিল্লাহ। আমরা অতি সাম্প্রতিককালে মাত্র ৫০ বছর পূর্বে বিজ্ঞান থেকে যা জানতে পেরেছি, পবিত্র কুরআন সে তথ্য আমাদের দিয়েছে ১৪০০ বছর পূর্বে। আর একই তথ্যটি পবিত্র কুরআন সূরা মুমিনুন এর ২১ নং আয়াতে পরিবেশন করে বলেছে–

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.

অর্থ : আর নিশ্চয়ই চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে তোমাদের জন্যে শিক্ষণীয় রয়েছে; আমি তার পেট থেকে তোমাদের পান করাই, তাতে তোমাদের অনেক উপকারী বিষয় রয়েছে; আর তা তোমরা ভক্ষণ করে থাক।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল একটি বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, "চতুষ্পদ প্রাণী জাতিগতভাবে বাস করে।" পবিত্র কুরআন সূরা আনআম-এর ৩৮ নং আয়াতে বলেছে– وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ.

অর্থ : পৃথিবীতে যেসব চতুষ্পদ প্রাণী এবং ডানায় ভর করে উড়ে বেড়ানো পক্ষীকুল রয়েছে তারা তোমাদের মতো জাতিগতভাবে বাস করে।

ডা. উইলিয়াম কাম্পবেল বলেছেন, 'আপনারা জানেন যে মাকড়সা তার সাথী এবং পিতাকে হত্যা করে– আমরা কি তা করি? আর সিংহ এবং হাতিও এভাবে হত্যা করে।" তিনি এসবের আচরণ সম্পর্কে বলেছেন, পবিত্র কুরআন এদের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করেনি।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল যদি কুরআন বুঝতে না পারতেন, তাহলে তিনি এটা বলতে পারতেন না যে কুরআন ভুল। কুরআন বলেছে, 'এরা জাতিগতভাবে বাস করে।' এটা বলা হয়েছে চতুষ্পদ প্রাণী এবং পাখিদের ব্যাপারে, যেগুলো দলবদ্ধভাবে বাস করে যেভাবে সমাজবদ্ধ হয়ে মানুষরা বাস করে। এটা এদের আচরণ সম্পর্কিত আলোচনা নয়।

কুরআনের সাথে বিজ্ঞান সামঞ্জস্যপূর্ণ

আমি ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের উত্থাপিত সব অভিযোগের যথোপযুক্ত জবাব প্রদান করেছি– আলহামদুলিল্লাহ। এমন একটি বিষয়ও নেই, যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, কুরআন বিজ্ঞানের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছে। ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল আমার উত্থাপিত ২২টি বিষয়ের একটিরও জবাব দেননি। দুটি বিষয় উত্থাপন করেছেন মাত্র কিন্তু প্রমাণ করতে সক্ষম হননি। সুতরাং এ ২২টি বিষয়ই প্রমাণ করে যে, বাইবেল গ্রন্থটি আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উপরন্তু এমন কিছু বিষয় বাইবেলে রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে আমি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা উপস্থাপন করতে পারি।

ক্যাম্পবেল উত্থাপিত অভিযোগের মধ্যে ২৫তম বিষয়টি হচ্ছে– প্রাণিবিদ্যা সম্পর্কিত।

লেভিটিকাস-এর ১১তম অধ্যায়ের ৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে– 'খরগোশ একটি জাবরকাটা প্রাণী'। আমরা জানি যে, খরগোশ জাবর কাটা প্রাণী নয়। অতীতে মানুষরা খরগোশের নড়াচড়া দেখে এমনটি ভাবত। এখন আমরা জানি যে, খরগোশ জাবর কাটা প্রাণী নয়, এছাড়া খরগোশের স্বয়ংক্রিয় পাকস্থলী নেই।

প্রভাবস-এর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৭নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে, 'পিঁপড়ার কোনো শাসক বা নেতা নেই।' আজকে আমরা জানি যে পিঁপড়া একটি সুশৃঙ্খল পোকা। তাদের পরিশ্রম করার একটি বিশেষ রীতি রয়েছে, যাতে তাদের মধ্যে একজন নেতা থাকে, তাদের একজন অগ্রগামী এবং অনেক কর্মী বাহিনী থাকে। তাদের একজন নেতা বা শাসক পর্যন্ত থাকে। অতএব, বাইবেল যে অবৈজ্ঞানিক তাতে সন্দেহ নেই।

বাইবেল ও বিজ্ঞানের বৈসাদৃশ্য

বাইবেলের জেনেসিসের ৩য় অধ্যায়ের ১৪নং অনুচ্ছেদ এবং ঈসায়ীর ৬৫ নং অধ্যায়ে ২৫নং অনুচ্ছেদ বলা হয়েছে, 'সাপ ধূলা খায়'। সাপ ধূলা খায় একথা কোনো ভূতাত্ত্বিক বইতেই বলা হয়নি। বাইবেলের অন্তর্গত লেভিটিকাসের ১১তম অধ্যায়ের ২০নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'বিভীষিকাময় বস্তুগুলোর মধ্যে পাখিরা চার পদবিশিষ্ট। এরা একটি বিভীষিকাময় প্রাণী।' আর কোনো কোনো বিশেষজ্ঞরা

বলছেন, 'পাখি' শব্দটি হিব্রু 'উফ' শব্দের ভুল অনুবাদ। নতুন আন্তর্জাতিক সংস্করণে বলা হয়েছে– 'পাখাওয়ালা সৃষ্টি।' কিন্তু এও বলছে, 'সকল চার পদবিশিষ্ট পোকাই হচ্ছে বিভীষিকাময়।' এগুলো আপনাদের জন্যে ক্ষতিকর।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, 'কোন্ ধরনের পোকার চারটি পা রয়েছে?' মাধ্যমিক স্তর পাস করা একজন ছাত্রও বলবে যে, পোকার পা ছয়টি। পৃথিবীতে এমন কোনো পাখি, জীবাণু কিংবা এমন কোনো পোকা নেই– যাদের পায়ের সংখ্যা চারটি। অধিকন্তু, বাইবেলে এমন প্রাণীর বর্ণনা দিয়েছে যেন এদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে রয়েছে।

এছাড়া ঈসায়ী বইয়ের ৩৪তম অধ্যায়ের ৭নং অনুচ্ছেদে এক শৃঙ্গের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যেন এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। আপনি অভিধানে দেখতে পারেন যে, এক শৃঙ্গ বলতে এমন অশ্বকে বোঝায় যার শিং একটি। আমি শুধু বলতে চাই যে, আমি যদি কোনো খ্রিস্টানের অনুভূতিতে আঘাত হেনে থাকি তাহলে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর সেটা আমার অভিপ্রায়ও ছিল না। এটা ছিল কেবল ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের বইয়ের জবাব যে, কুরআন বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আর বাইবেলের কোনো একটি বিশেষ অংশ প্রভুর কথা হলেও, সম্পূর্ণ বাইবেল অবশ্যই প্রভুর কথা নয়–এটা কোনো আপস নয়। পরিশেষে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রতিটি অভিযোগের সুস্পষ্ট জবাব দিতে পেরে আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করছি। স্মরণ করছি, পবিত্র কুরআনের সূরা ইসরা-এর ৮১ নং আয়াত, যেখানে বলা হয়েছে–

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا .

অর্থ : সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসারিত। নিশ্চয়ই মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য।

পর্যালোচনা পর্ব

ডা. ক্যাম্পবেলকে প্রশ্ন : বলা হয়ে থাকে যে, নূহের প্লাবনের সময় সমগ্র ভূপৃষ্ঠই প্লাবিত হয়েছিল। সমগ্র সৃষ্টি জগৎ এবং পাহাড়-পর্বত পর্যন্ত সবকিছুই প্লাবিত হয়েছিল। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, এই প্লাবনে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ প্লাবিত হয়েছিল। যার উচ্চতা ছিল ১৫ কিউবিট (আঠার থেকে বাইশ ইঞ্চির সমপরিমাণ দূরত্ব সমান ১ কিউবিট)। আরবি 'কদম' শব্দের অর্থ ফুটের সমপরিমাণ দূরত্ব। সুতরাং আমরা জানি বৈজ্ঞানিকভাবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা ১৫ ফুট হওয়ার বিষয়টি সত্য নয়। আপনি জানেন যে, উক্ত শৃঙ্গের উচ্চতা ১৫ ফুটের চেয়ে বহুগুণে বেশি। সুতরাং ওল্ড টেস্টামেন্টে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত যে বিবরণ রয়েছে তা কীভাবে সত্য হতে পারে? অর্থাৎ পানি কীভাবে সবকিছুকে প্লাবিত করেছিল? কীভাবে তা পৃথিবীর প্রতিটি পর্বতকে প্লাবিত করতে পারে– যার সর্বাধিক উচ্চতা মাত্র ১৫ ফুট বলা হয়েছে?

উত্তর : আমার মনে হয় এটা কেবল একটি প্রবাদ যে, পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতের উচ্চতা মাত্র ১৫ কিউবিট। যদি সর্বোচ্চ পর্বতের উচ্চতা ৩০০০ মিটার হয়, ভালো কথা। উচ্চতা ১৫ ফুট সর্বোচ্চ পর্বতের উপরে, এটা হতে পারে। এরপর আমি পবিত্র কুরআনের দিকে দৃষ্টি দিব। আমার মনে হয়, পবিত্র কুরআনের বক্তব্য হতেও বিষয়টি একইভাবে উপলব্ধি করা যায়। কারণ , পবিত্র কুরআনের সূরা হুদ এর ৪২ নং আয়াতে বলা হয়েছে, وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِيْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ .

অর্থ : আর তা তাদেরকে নিয়ে সামনে বয়ে চলল পর্বতের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গমালার বুকে।

তখন এটা এমন জায়গায় বলা হয়েছে যেখানে নবীদের তালিকা দেয়া হয়েছে– সেখানে হযরত নূহ (আ)-এর পূর্বে কোনো নবী ছিলেন না। আমার জানা মতে, আদম (আ)ও একজন নবী ছিলেন, কিন্তু আমি সেখানে ছিলাম না যেখানে এ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। আর আমি মনে করি, এটা পবিত্র কুরআনেও আছে যে, সমগ্র পৃথিবীই প্লাবিত হয়েছিল।

ডা. জাকির নায়েককে প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, আল্লাহ আলোর প্রতিফলন ঘটান এবং তিনি নূরের সৃষ্টি– আমি বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে পারিনি। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করবেন কি?

উত্তর : ভাই আমার প্রতি একটি প্রশ্ন রেখেছেন যে, তিনি আমার প্রতিপক্ষ ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের কথার জবাবে 'নূর' এবং 'আল্লাহ' শব্দদ্বয়ের ব্যাখ্যাটি

সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে, اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.

অর্থ : আল্লাহ পৃথিবী ও আসমানের নূর বা জ্যোতি।

অর্থাৎ আল্লাহ হচ্ছেন নূর বা জ্যোতি। 'নূর' শব্দের অর্থ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 'প্রতিফলিত আলো' বা 'ধারণকৃত আলো'। সুতরাং প্রশ্নটির উত্তর পুনরায় দেয়া হলো, যদি আপনি আয়াতটি পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন এটি বলছে যে, এটি একটি কুলুঙ্গির ন্যায় আলো। কুলুঙ্গিতে একটি বাতি থাকে, যাতে তার নিজস্ব আলো আছে। যার অর্থ আল্লাহ নিজেই আলো এবং তাঁর এই নিজস্ব আলো প্রতিফলিতও হয়।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আলো পুনরায় আল্লাহর নিজস্ব আলোতে প্রতিফলিত হয়, যেভাবে একটি বৈদ্যুতিক বাতি আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন। এর ভেতরে একটি টিউব আছে। এ বাতিটিকে বলা যেতে পারে 'সিরাজ' 'ওয়াহাজ' কিংবা 'দিয়া' আর প্রতিবিম্বকে বলা যেতে পারে 'মুনীর' কিংবা 'নূর'- যার অর্থ 'প্রতিফলিত আলো' বা 'ধারণকৃত আলো'। কিন্তু আপনি যে বাতি সম্পর্কে কথা বলছেন তা প্রকৃতপক্ষে কোনো শারীরিক আলো নয়; বরং এটা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রুহানি বা আধ্যাত্মিক আলো। কিন্তু একটি জবাব, যা আমি ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলকে দিয়েছিলাম তা আমি পুনরায় যথাযথভাবে উল্লেখ করতে চাই।

হযরত নূহ (আ) এর সময়ের প্লাবন সম্পর্কে প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল। আমিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি বাইবেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি এবং কুরআনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি ব্যবহার করে বক্তব্য রাখি, কারণ, উভয় পদ্ধতিতেই পবিত্র কুরআন শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখে, আলহামদুলিল্লাহ। আর আমি যদি ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের সাথে একমত হই যে এটাই সঠিক, যেখানে বলা হয়েছে যে প্লাবনের পানি সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গের উপরে ১৫ ফুট উচ্চতায় পৌঁছেছিল। কিন্তু এটার বর্ণনা ওল্ড টেস্টামেন্টের জীবনবৃত্তান্তের (জেনেসিসের) ৭ নং অধ্যায়ের ১৯ এবং ২০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সমগ্র পৃথিবীই পানির তলদেশে চলে গিয়েছিল।'

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলে যে, এ প্লাবনটি নূহ (আ)-এর সময়কালের অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ২২ শতাব্দী সালে সংঘটিত হয়েছিল। আজকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আমাদের বিষয়টি প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, ব্যাবিলনের ৩য় রাজবংশ এবং মিসরের একাদশ রাজবংশ খ্রিস্টপূর্ব ২১ থেকে ২২ শতাব্দী সালে ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু সে সময়কালের কোনো প্লাবনের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা বিষয়টিকে ব্যাখ্যা ছাড়াই ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সাথে কুরআন সামঞ্জস্যপূর্ণ

সর্বশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ আমাদের দেখিয়েছে, এটা অসম্ভব যে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ প্লাবিত হয়েছিল- সমগ্র পৃথিবী খ্রিস্টপূর্ব ২১ থেকে ২২ শতাব্দী সালে পানির নিচে নিমজ্জিত হয়েছিল। কিন্তু পবিত্র কুরআন এ সম্পর্কে কী বলে?

প্রথমত পবিত্র কুরআন কোনো তারিখ দেয়নি। এমন কথা বলেনি যে খ্রিস্টপূর্ব ২১ শতাব্দী কিংবা খিস্টপূর্ব ২২ শতাব্দী সালে ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, পবিত্র কুরআন কোথাও বলেনি যে সমগ্র পৃথিবী পানির তলদেশে নিমজ্জিত হয়েছিল। পবিত্র কুরআন হযরত নূহ (আ) এবং তাঁর কওম বা জাতি সম্পর্কে আলোচনা করেছে। নূহ (আ)-এর জাতি ছিল মানবজাতির একটি শাখা বা বৃহত্তর শাখা। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আজকে আমাদের বলছে এবং প্রত্নতত্ত্ব বিশারদগণও বলছেন, আমাদের কোনো আপত্তি নেই- এটা সম্ভব যে, পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট অংশ পানির নিচে প্লাবিত হয়েছিল। কিন্তু সমগ্র পৃথিবী পানির নিচে নিমজ্জিত হতে পারাটা অসম্ভব। এভাবে, আলহামদুল্লিাহ, পবিত্র কুরআন সর্বশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সাথে সাম স্যপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বাইবেলের বক্তব্য এর বিপরীত। যদি আপনি ওল্ড টেস্টামেন্টের ৬ নং অধ্যায়ের ১৫ এবং ১৬ নং ধারাটি পড়েন তাহলে দেখবেন, এটি প্রভু সম্পর্কে বলছে যে, তিনি নূহ (আ)-কে একটি নৌকা তৈরি করতে বলেছিলেন- যার দৈর্ঘ্য হবে ৩০০ কিউবিট এবং প্রস্থ হবে ৫০ কিউবিট ও উচ্চতা হবে ৩০ কিউবিট। ১ কিউবিটে দেড় ফুট। ভাই ক্যাম্পবেল একটু ভুল বলেছেন। আধুনিক আন্তর্জাতিক সংস্করণ বলেছে, ৪৫০ ফুট দৈর্ঘ্য, ৭৫ ফুট প্রস্থ এবং প্রায় ৪৫ ফুট উচ্চতা ছিল জাহাজটির। আমি বিষয়টি গণনা করে দেখেছি যে এর ঘনফল ১৫০ হাজার ঘনফুটের কিছুটা কম এবং আয়তন ৩৩,৭৫০ বর্গফুট। আর বাইবেলে বলা হয়েছে, জাহাজ ৩ তলাবিশিষ্ট ছিল- প্রথম তলা, দ্বিতীয় তলা এবং তৃতীয় তলা। সুতরাং, উক্ত আয়তনকে ৩ দ্বারা গুণ করলে এর আয়তন পাওয়া যায় ১০১ হাজার, ২৫০ বর্গফুট। বিষয়টি ভেবে দেখুন, পৃথিবীর সব জীবের ১ জোড়া করে এই ১০১ হাজার ২৫০ বর্গফুট জাহাজে তুলে নেয়া হয়েছিল। চিন্তা করে দেখুন, এটা কি সম্ভব? পৃথিবীতে মিলিয়ন মিলিয়ন জীবন রয়েছে। যদি আমি বলি, 'এই অডিটোরিয়ামে এক মিলিয়ন লোক উপস্থিত হয়েছে।'

তাহলে আপনারা কি বিশ্বাস করবেন?

আমার মনে আছে, কেরালায় আমার এক সভায় এক মিলিয়ন লোক উপস্থিত হয়েছিল। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে, এটা ছিল আমার দেয়া লেকচারসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ জনসমাগম। এক মিলিয়ন লোক। আমি লেকচারের শেষটা দেখতে পাইনি। এটা কোনো অডিটোরিয়াম ছিল না- বরং এটা ছিল একটা বড় সমুদ্র উপকূল। আমি সামনে বসা কয়েকজন লোক ছাড়া আর

Contents

কিছুই দেখতে পাইনি। আপনি যদি ঐ ১ মিলিয়ন জনসমুদ্রের ভিডিও ক্যাসেটটি দেখেন তাহলে দেখবেন যে, ১ মিলিয়ন কত বড়। আরাফার ময়দানে আড়াই (২.৫০) মিলিয়ন লোক উপস্থিত হয়। সুতরাং ১০১ হাজার ২৫০ বর্গফুটের কিংবা ১৫০ হাজার ঘনফুটের একটি জাহাজে পৃথিবীর সকল জীবের এক জোড়া প্রাণীর অবস্থান অসম্ভব? তাছাড়া এ সকল প্রাণী সেখানে ৪০ দিন অবস্থান করেছিল। তারা সেখানে খেয়েছে এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়েছে। যদি বলা হয়, ১ মিলিয়ন লোক এই অডিটোরিয়ামে এসেছে– আপনি কি বিশ্বাস করবেন? সুতরাং, বৈজ্ঞানিকভাবে সেখানে এমন কতিপয় বিষয় রয়েছে যা বাইবেলের বর্ণনাকে ভুল প্রমাণিত করে।

ডা. ক্যাম্পবেলের প্রতি প্রশ্ন : আপনি কেন বাইবেলের জালকরণ শীর্ষক পরীক্ষায় নিজেকে সম্পৃক্ত করছেন না? অথচ মার্কের বইয়ের ১৬তম অধ্যায়ের ১৭ ও ১৮ নং ধারার বর্ণনায় অডিয়েন্সের নিকট এইমাত্র প্রমাণিত হয়েছে যে আপনি একজন সত্যিকার খ্রিস্টীয় দর্শনে বিশ্বাসী?

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : আমি ডা. জাকির নায়েকের ব্যাখ্যার সাথে একমত নই। প্রভু যিশু নিজেই পরীক্ষিত হয়েছিলেন এবং শয়তান বলেছিল, 'যদি তুমি প্রভুর ছেলে হয়ে থাকো, তাহলে তোমার নিজেকে গীর্জায় নিয়োজিত করো।' আর তখন যিশু বলেছিলেন,'তুমি তোমার প্রভুকে পরীক্ষা করতে পারবে না।' আমি যদি ঐ দিনে সেখানে থাকতাম তাহলে বলতাম, 'হ্যাঁ, আমি বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্যে তোমার সামনে একটি অলৌকিক ঘটনা দেখাচ্ছি।

আমি প্রভুকে পরীক্ষা করতাম। বন্ধুগণ, আমার বন্ধু হ্যারি র‍্যানক্লিফ যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আর তিনি তার প্রতিজ্ঞা রেখেছিলেন এবং সত্য প্রভু তার ইচ্ছাকে পূরণ করেছিলেন। এটি একটি আলাদা পরিস্থিতি। আমি প্রভুকে পরীক্ষা করতে পারব না।

ডা. জাকির নায়েককে প্রশ্ন : খ্রিস্টানরা ত্রিত্ববাদের ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে পানির দৃষ্টান্ত প্রদান করে থাকে। কারণ, পানির তিনটি অবস্থা রয়েছে। যেমন : কঠিন, তরল এবং বায়বীয়। বরফ অবস্থায় পানি কঠিন আকার ধারণ করে। একইভাবে, একক প্রভুরই তিনটি অবস্থা তথা এক প্রভুতেই তিন প্রভুর অবস্থান- পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা মা মেরী। বৈজ্ঞানিকভাবে এ ব্যাখ্যাটি কি সঠিক?

ডা. জাকির নায়েক : প্রশ্নটির উত্তর দেয়ার পূর্বে একটি মন্তব্য করতে চাই– 'আমাদের প্রভুকে পরীক্ষা করা উচিত নয়।' কিন্তু এখানে আমরা প্রভুকে পরীক্ষা করছি না, আমরা মানব নামক জীবকে পরীক্ষা করছি। আমরা আপনাদের পরীক্ষা করছি আর প্রভু প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, যেকোনো বিশ্বাসী লোক মারা যাবে না– সে বিদেশী ভাষায় কথা বলতে পারবে। যেহেতু আমরা জানি যে প্রভু সঠিক– তাই আমরা প্রভুকে পরীক্ষা করছি না। তিনি এটা দেখবেন যে, প্রত্যেক বিশ্বাসীই কথা বলতে পারবেন। আমরা আপনাদের পরীক্ষা করছি, যাতে আপনারা বিশ্বাসী কিনা তা যাচাই করতে পারি।

এখন প্রশ্নের উত্তরে আসি। বৈজ্ঞানিকভাবে আমি একমত পোষণ করি যে, পানির ৩টি অবস্থা। যেমন : কঠিন, তরল ও বায়বীয়– বরফ, পানি এবং জলীয় বাষ্প থাকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে আমরা আরো জানি যে, পানির উপাদানগুলো উক্ত তিন অবস্থায় একরূপই থাকে। H_2^0-যাতে হাইড্রোজেনের ২টি অণু এবং অক্সিজেনের একটি অণু। উপাদানসমূহ এবং গঠন একই সমান থাকে। কেবল রূপটা পরিবর্তিত হয়। এতে কোনো সমস্যা নেই। এখন আমাদের ত্রিত্ববাদের অর্থাৎ পিতা, পুত্র এবং মা মেরি রূপের ধারণাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে চাই। তারা বলে, "রূপ পরিবর্তিত হয়।" বিতর্কের খাতিরে যদি আমরা ধরেও নিই, তাহলে উপাদানগুলোর কি পরিবর্তন হতে পারে? প্রভু এবং মা মেরীকে আধ্যাত্মিকভাবে তৈরি করা হয়েছে। মানব নামক জীবকে গোশত এবং হাড়ের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছে। তারা কখনোই সমান হতে পারে না। মানব নামক জীব খাদ্যের প্রয়োজন অনুভব করে অথচ প্রভু বাঁচার জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন অনুভব করে না। সুতরাং তারা সমান নয়। আর এ বিষয়েই পরীক্ষিত হয়েছিলেন যিশুখ্রিস্ট।

লুক-এর ২৪ নং অধ্যায়ে ৩৬ থেকে ৩৯ নং অনুচ্ছেদে এর বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেছেন যে, "আমার হাত ধরো এবং হাঁটো– আমাকে চালাও এবং দেখো, আত্মার কোনো মাংস বা হাড্ডি নেই।" আর তখন তিনি তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তারা দেখলো আর অত্যধিক আনন্দে ফেটে পড়লো। তিনি বললেন, "আপনার নিকট কি খাওয়ার মতো কোনো গোশত আছে?" তারা তাকে অধিক তাপে ঝলসানো মাছ এবং এক টুকরো মৌচাক দেয় যা তিনি খেয়েছিলেন। এটা কী প্রমাণ করে? তিনি কি প্রভু ছিলেন? এর প্রমাণ এটাই যে তিনি প্রভু ছিলেন না। তিনি খেতেন এবং তার গোশত এবং হাড় ছিল, অথচ আত্মার কোনো গোশত এবং হাড় থাকে না। এটা প্রমাণ করে যে, বৈজ্ঞানিকভাবে প্রভু, যিশু এবং মা মেরী-এ তিনজন সর্বশক্তিমান প্রভু নন। ত্রিত্ববাদের ধারণাটির মধ্যে ব্যবহৃত ত্রিত্ববাদ শব্দটি বাইবেলের কোথাও দেখা যায় না। বরং ত্রিত্ববাদের ধারণাটি ব্যক্ত

Contents

করা হয়েছে পবিত্র কুরআনে। যেমন, পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১৭১ নং আয়াতে বলা হয়েছে– وَلَا تَقُولُوا ثَلٰثَةٌ ۔ اِنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ۔

অর্থ : ত্রিত্ববাদের কথা বলো না, এটা বলা ছেড়ে দাও। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম পন্থা।

এছাড়া সূরা মায়িদার ৭৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۔ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۔

অর্থ : যারা বলে, আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন, তারা তো কুফরী করেছেই। যদিও এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই।

একথা যিশুখ্রিষ্ট কখনোই বলেননি যে তিনি নিজেই প্রভু। ত্রিত্ববাদের ধারণাটি বাইবেলের কোথাও পাওয়া যায় না। কেবল একটি ধারা যা ত্রিত্ববাদের ধারণাটির সন্নিকটবর্তী– তা হচ্ছে জন বিরচিত Epistle-এর পঞ্চম অধ্যায়ের ৭ নং ধারাটি। এ ধারটিতে বলা হয়েছে, 'স্বর্গে পিতা, যিশু এবং পবিত্র মা সকল রেকর্ড বহন করবেন।' আর এই তিনজনই হচ্ছেন একজন। কিন্তু যদি আপনি এর পরবর্তী সংস্করণটি পড়েন,যা ৩২ জন খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞ লিখেছেন তাতে তারা বলেছেন, বাইবেলের এ ধারাটি হচ্ছে একটি প্রক্ষেপণ, একটি বানানো গল্প, একটি মিথ্যা কাহিনী। এটি অন্যায়ভাবে বাইবেলে প্রবেশ করানো হয়েছে।

সত্য এই যে, যিশুখ্রিষ্ট কখনো প্রভুত্ব দাবি করেননি। সমগ্র বাইবেলের কোথাও একটি বর্ণনাও পাওয়া যায় না যাতে যিশুখ্রিষ্ট বলেছেন, 'আমি প্রভু।' কিংবা যাতে তিনি বলেছিলেন, 'আমার উপাসনা করো।'

আপনি যদি বাইবেল পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন যে, জন বিরচিত Gospel-এর ১৪তম অধ্যায়ের ২৮ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে যে, তিনি বলেছেন, 'আমার পিতা আমার চেয়ে মহত্তর।' জন বিরচিত ১০ম অধ্যায়ের ২৯ নং অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন, আমার পিতা সকলের চেয়ে ক্ষুদ্রতম' ম্যাথিউ বিরচিত Gospel-এর১২তম অধ্যায়ের ২৮ নং অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন, 'আমি প্রভুর আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শয়তানকে বিতাড়িত করছি।' লুক বিরচিত Gospel-এর ১১তম অধ্যায়ের ২০তম অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন, 'আমি প্রভুর আঙ্গুলি দিয়ে শয়তানকে বিতাড়িত করছি। জন বিরচিত Gospel-এর ৫ম অধ্যায়ের ৩০ নং অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন, 'আমি নিজের থেকে কোনো কাজ সম্পাদন করি না।' যেভাবে আমি শুনি, আমি বিচার করি এবং আমার বিচারই সঠিক, আমি নিজের ইচ্ছায় কিছুই করি না; বরং আমার প্রভুর পিতার ইচ্ছায় সবকিছুই করি।'

কেউ যদি বলে, 'আমার ইচ্ছায় নয়; বরং প্রভুর ইচ্ছায়ই সবকিছু করি' তাহলে সে মুসলমান হয়ে যায়। মুসলিম মানে হচ্ছে এমন একজন লোক যে তার নিজ ইচ্ছাকে মহান আল্লাহর ইচ্ছার নিকট সমর্পণ করে। যিশুখ্রিষ্ট বলেছিলেন, "আমার ইচ্ছায় নয়; বরং প্রভুর ইচ্ছায়ই সবকিছু করি।' তিনি ছিলেন একজন মুসলিম। আলহামদুলিল্লাহ। তিনি ছিলেন মহান প্রভুর প্রেরিত সবচেয়ে শক্তিমান রাসূলগণের অন্যতম। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি আল্লাহর অনুমতিতে মৃতকে জীবন দান করতে পারতেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি জন্মান্ধকে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিতে পারতেন মহান আল্লাহর অনুমতিতে। আমরা যিশুখ্রিষ্টকে মহান আল্লাহর প্রেরিত শক্তিমান রাসূলদের অন্যতম হিসেবে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তিনি প্রভু নন আর তিনি তিন খোদার একজনও নন। পবিত্র কুরআন বলেছে, 'হে নবী করীম (স) বলুন, তিনিই প্রভু, যিনি এক ও অদ্বিতীয়'।

ডা. ক্যাম্পবেলের প্রতি প্রশ্ন : প্রশ্নটি হচ্ছে, আজকে রাতে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। এটা আমাদের উপকার করতে পারে। আর তাই আমি ডা. ক্যাম্পবেলকে জিজ্ঞেস করতে চাই, একজন খ্রিস্টান এবং আপনার সহকর্মী হিসেবে বলতে চাই, এই পর্বটি কি আপনার হৃদয়কে খুলে দেবে? অন্ততপক্ষে এ আলোচনা কি আপনার হৃদয়পটে এতোটুকু আলো প্রজ্জ্বলিত করবে যা ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে আপনাকে অনুসন্ধানী হতে উৎসাহ যোগাবে?

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : ভালো, আমি মনে করি আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে ইতিপূর্বে করা সর্বশেষ প্রশ্নটির উত্তরের সাহায্য নিব। ডা. জাকির নায়েক বলেছেন, 'এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে যিশু বলেছেন যে তিনি প্রভু।' মার্কের ১৪ ঃ ৬১ ধারায়, তিনি জবাব দেননি এবং পুনরায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের পুরোহিতগণ তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন, 'আপনি কি প্রভুর ছেলে খ্রিষ্ট? আর এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আমি প্রভুর সন্তান খ্রিস্ট।' অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, 'আমি প্রভুর ছেলে।' আর তিনি বলেছেন যে 'তিনি স্বর্গীয়।' বাইবেলে এ কথাটি পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। আমার মনে হয় ডা. জাকির যেসব ধারাগুলোর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেগুলোর উদ্ধৃতি দেয়ার ইচ্ছা তিনি পোষণ করেছেন এবং যেখানে যিশু মানবীয় রূপে ছিলেন। কিন্তু অন্য জায়গায় এমন সব ধারা রয়েছে যাতে তিনি বলেছেন, 'আমি এবং প্রভু (পিতা) একজনই।'

Contents

এ ধারাটি বলেছে যে, 'আদিতে ছিল একটি কথা, আর এ কথাটি বলেছেন প্রভু গোশতের তৈরি, আর তিনি আমাদের মাঝেই বাস করেন।'

একটি খ্রিষ্টীয় অনুষ্ঠানে পিতা কথা বলছেন এবং বলছেন, 'এই হচ্ছে আমার স্নেহের পুত্র।' যিশু সেখানে ছিলেন এবং পবিত্র আত্মা সেথায় অবতরণ করেছিল। পিতা (প্রভু), ছেলে এবং পবিত্র আত্মা মা মেরী। এ বিষয়টি আমরা কোনো একটি খাত থেকে তৈরি করিনি। কেবল একটি ছোট বিষয় হিসেবেই নিয়েছি। আর এখন আমার বন্ধু এখানে আমাকে প্রশ্ন করছেন- 'আমরা বেশ কিছু বিষয় শিখেছি।' আর আমি সবসময়ই শিখতে চাই। কিন্তু আমি এখনো মনে করি যে, ৫০০ প্রত্যক্ষদর্শী দেখেছেন যে যিশু জীবিত করেছেন- যা আমার নিকট তার ৬০০ বছর পরে আবির্ভূত হওয়া মোহাম্মদ (স) এর চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী মনে হয়। আপনাকে ধন্যবাদ।

ডা. জাকির নায়েককে প্রশ্ন : ডা. ক্যাম্পবেল প্রথমেই বলেছিলেন যে, তিনি পবিত্র কুরআনে পৃথিবী সম্পর্কে যেসব ভুল-ত্রুটির ভাষণ রয়েছে তা আলোচনা করবেন, আর আপনি এসব অভিযোগ খণ্ডন করবেন। যা হোক, এটি আলোচনা করা হয়নি বাইবেলে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে কী বলা হয়েছে? এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়সমূহ কী কী?

ডা. জাকির নায়েক : বোন, আপনি বলেছেন, বাইবেলে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা আমি আলোচনা করিনি। এটা সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে হয়েছে। আমি এ সম্পর্কে ১০০টি পয়েন্ট বের করতে পারি কিন্তু সময়ের সংক্ষিপ্ততার কারণে তা করতে পারছি না। যা হোক, বোন জানতে চেয়েছেন বাইবেলে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে কী কী বলা হয়েছে?

এটা বাইবেলে বর্ণিত আছে- ম্যাথিউ রচিত গসপেলের ৪ নং অধ্যায়ের ৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। এ রেফারেন্সটি পরীক্ষা সম্পর্কিত আলোচনায় ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ, যিশু উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ অতিক্রম করার সময় তাঁকে সমগ্র পৃথিবীর সকল রাজ্য এবং এর গৌরবান্বিত বিষয়সমূহকে দেখানো হয়েছিল। লূক বিরচিত গসপেলের ৪র্থ অধ্যায়ের ৫নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'শয়তান তাকে সুউচ্চ পর্বতের ওপর নিয়ে গেল এবং তাঁকে সমগ্র পৃথিবীর রাজ্যসমূহের গৌরবান্বিত বিষয়সমূহ দেখালো।' অর্থাৎ বাইবেল বলছে-পৃথিবীর আকার স্ফীত।

আপনি যদি পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতে আরোহণ করেন, অর্থাৎ যদি মাউন্ট এভারেস্টে আরোহণ করেন আর যদি আপনার চোখের দৃষ্টি ভালো থাকে এবং আপনি একই সময়ে হাজার হাজার মাইল দেখতে পান, তবুও আপনি পৃথিবীর সমগ্র রাজ্যসমূহ দেখতে পাবেন না কারণ, আজকে আমরা জানি- পৃথিবী গোলাকার। আপনি পৃথিবীর বিপরীত অংশের রাজ্যসমূহকে দেখতে পাবেন না। এটা কেবল তখনই সম্ভব হতে পারে যখন পৃথিবী গোলাকার না হয়ে স্ফীত আকার বিশিষ্ট হবে। এটাই বাইবেলের বর্ণনা, যার দ্বারা বোঝা যায় যে, 'পৃথিবীর আকার হচ্ছে স্ফীত।'

প্রথম কালানুক্রমিক ১৬ নং অধ্যায়ের ৩০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'পৃথিবী ঘোরে না'। একই বর্ণনার পুনরাবৃত্তি আবারও করা হয়েছে ড্যানিয়েল বিরচিত বইয়ের ৪র্থ অধ্যায়ের ১০ ও ১১ নং ধারায়। বলা হয়েছে, 'একটি স্বপ্নে দেখা গেল যে, স্বর্গে একটি গাছ বেড়ে ওঠল, যখন এটি বেড়ে ওঠল তখন এটি উঁচু হলো যে, পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকেই ঐ বৃক্ষটিকে প্রত্যেকে দেখতে পারল।' এটা কেবল তখনই সম্ভব যখন পৃথিবীর আকার স্ফীত হয়। যদি গাছটি অনেক উঁচু হয় এবং পৃথিবীর আকার স্ফীত হয় তাহলেই কেবল এটি সম্ভব। আজকে এটি সার্বজনীন গ্রাহ্য বিষয় যে, পৃথিবী গোলাকার। আপনি গোলাকার পৃথিবীর বিপরীত দিক থেকে গাছটি যতই উঁচু হোক না কেন তা দেখতে পাবেন না।

আপনি যদি পড়েন, এটি ১ম কালানুক্রমিকের ১৬ নং অধ্যায়ের ৩০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'পৃথিবী ঘোরে না।' Psalms কর্তৃক রচিত বইয়ের ৯৩ নং অধ্যায়ের ১ নং অনুচ্ছেদে এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ পৃথিবীকে স্থির করে দিয়েছেন।' যার অর্থ দাঁড়ায় পৃথিবী ঘোরে না। নতুন আন্তর্জাতিক সংস্করণে এটা বলা হয়েছে যে, 'প্রভু অদ্যাবধি পৃথিবীকে স্থির এবং এর ঘূর্ণায়নকে বন্ধ করে রেখেছেন।'

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বললেন, যিশুখ্রিস্ট বাইবেলের বেশ কয়েক জায়গায় বলেছেন যে, 'তিনি ছিলেন প্রভু।' আপনি আমার Concept of God in major Religions (বিভিন্ন ধর্মে প্রভুর ধারণা) শিরোনামের ভিডিও ক্যাসেটটি দেখতে পারেন, যাতে সকল প্রকার রেফারেন্স এবং প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। আমি এখানে কেবল তাঁর উদ্ধৃত একটি রেফারেন্সের জবাব দেব। তিনি বলেছেন, 'আমি এবং আমার পিতা একজনই।' এটা জন রচিত বাইবেলের ১০ নং অধ্যায়ের ৩০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে। এছাড়া জন রচিত বাইবেলের ১ নং অধ্যায়ের ১ নং

অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'আদিতে ছিল কেবল একটি কথা বা শব্দ।' যিশুখ্রিষ্ট কখনোই প্রভুত্ব দাবি করেননি। আপনারা আমার পূর্বোক্ত ভিডিও ক্যাসেট আর Similarities between Islam and Christianity (ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য) শীর্ষক ভিডিও ক্যাসেটটি দেখুন। এসব ক্যাসেটে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, যিশুখ্রিষ্ট কখনোই প্রভুত্ব দাবি করেননি।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের প্রতি প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, একজন সত্যিকার বিশ্বাসী লোক বিষ পান করেও তার বিশ্বাসের জোরে বেঁচে থাকতে পারে। তাহলে রাসপুটিন যিনি সায়ানাইড দ্বারা বিষাক্রান্ত করে ১৬ জন লোককে হত্যা করেছিলেন কিন্তু এটা তাকে হত্যা করতে পারেনি। তিনি রক্তশূন্যতার কারণে মারা গিয়েছিলেন। তিনি একজন ভালো খ্রিস্টান ছিলেন না। আপনি এটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন? ভালো, কেবল একজন ভালো খ্রিস্টানই এ বিষ পান করতে পারে এবং বেঁচে থাকতে পারে– এটাকে আপনি বিশ্লেষণ করবেন কীভাবে?

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : ভালো প্রশ্ন। আমি ভাবিনি যে, এটা আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। আমি মনে করি, যদি রাসপুটিন একজন ভালো খ্রিস্টান না হয়, তাহলে তার প্রতি যা ঘটেছিল তা বাইবেলে বর্ণিত বিষয়ের ভিত্তি হতে পারে না। আমি ইতোপূর্বে বলেছিলাম, যিশু-প্রভু আমাদের সঠিক লাইনের বাইরে চলতে এবং এখনই বিষ পান শুরু করার নির্দেশনা দেননি। দুঃখিত, এটি প্রভুকে পরীক্ষা করার জন্যে ছিল না। এটা এজন্যেই বলা হয়েছিল যে, এসব বিষয় অবশ্যই ঘটবে। এর একটি উদাহরণ হতে পারে পল– যে গিয়েছিল যখন সে জাহাজ ডুবিতে পতিত হয়েছিল। তখন সে, আমি মনে করি, এটা চিন্তা করলে গা শিউরে ওঠে, কিন্তু আমি ভুল জায়গার কথা উল্লেখ করছি। আর সে ভূপাতিত হয়েছিল। আর এভাবে সে আগুনে কাঠ নিক্ষেপ করেছিল এবং একটি সাপ তাকে দংশন করেছিল কিন্তু তার কিছুই হয়নি। কিন্তু সে প্রভুকে পরীক্ষা করতে চায়নি– সে আগুনে কাঠ নিক্ষেপ করতে চেয়েছিল। এটা ছিল একটি কঠিন পরিস্থিতি। এটা যেন পৃথিবীর চক্র সম্পর্কে কোনো কিছু বলা। ঈসাঈ'র ৪০ : ২২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'তিনিই প্রভু, যিনি পৃথিবীর চক্রের উপরিভাগে অবস্থান করে আছেন।'

ডা. জাকির নায়েককে প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, পবিত্র কুরআনে কোনো ভুল নেই। কিন্তু আমি দেখেছি যে, এতে ২০টিরও অধিক আরবি ব্যাকরণগত ভুল রয়েছে। আমি এদের মধ্য থেকে আপনাকে কয়েকটি উল্লেখ করতে চাই। এই

যেমন সূরায় বাকারা ও সূরা হাজ্জ -এ বলা হয়েছে– 'আসাবিউন' কিংবা 'আসাবিরীন' এটা ১ নম্বর ভুল। দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে, আপনি বলেছেন, প্রায় একই বিষয় যা সূরা ত্ব-হা'র ৬৩ নং আয়াতে রয়েছে এটাও ভুল। এটি কি আপনি ব্যাখ্যা করতে পারেন? আর সেখানে এর চেয়েও মারাত্মক ভুল রয়েছে।

ডা. জাকির নায়েক : আমার ভাই একটি অত্যন্ত ভালো প্রশ্ন করেছেন। আমাকে আরো অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যথার্থ হতে হবে। তিনি ২০টি ব্যাকরণগত সমস্যার কথা বলেছেন। আর তিনি সম্ভবত আব্দুল ফাদি কর্তৃক রচিত বই থেকে উল্লেখ করেছেন, বইটা কি সঠিক? কুরআন কি ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়?

এখানে আমি ২০টি প্রশ্নেরই উত্তর দিব কারণ আমি উল্লিখিত বইটি পড়েছি। প্রথম বিষয়টি হচ্ছে সকল আরবি ব্যাকরণই পবিত্র কুরআন থেকে সংকলিত হয়েছে। আর কুরআন হচ্ছে উচ্চমানের আরবি বই। এটা এমন একটি বই যাতে সর্বোচ্চ মানের সাহিত্য সন্নিবেশিত হয়েছে। ব্যাকরণের যতসব পাঠ্য বই রয়েছে এদের সবই পবিত্র কুরআনের নিয়ম-কানুনের আলোকে সংকলিত হয়েছে। যেহেতু কুরআন হচ্ছে আরবি ব্যাকরণের নিদর্শন আর সকল আরবি ব্যাকরণই পবিত্র কুরআন থেকে সংকলিত সেহেতু এখানে কোনো ভুলই থাকতে পারে না।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, এটা আপনার জানা রোলার গ্রহণ করার ন্যায় এবং রোলারের একটি পরিমাপ রয়েছে। এখন আপনি বলতে পারেন, পরিমাপটি ভুল– এ ধরনের কথা অযৌক্তিক। দ্বিতীয় বিষয়টিতে বলা যায়, আপনিও জানেন যে আরবরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিলেন। আর ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলও আমার সাথে একমত হবেন যে, বিভিন্ন গোত্র বিদ্যমান থাকায় আরবি ব্যাকরণও বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। কোনো গোত্রে একটি শব্দ স্ত্রীবাচক হতে পারে। ঠিক ঐ শব্দটিই অন্য গোত্রে পুংলিঙ্গবাচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একই শব্দের এ রকম বিভিন্ন লিঙ্গে ব্যবহারের কারণে ব্যাকরণে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এমনকি সঙ্গের লিঙ্গও বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং আপনি কি ভুলকৃত ব্যাকরণ দিয়ে কুরআন যাচাই করবেন? অবশ্যই না। আরও যে বিষয়টি বলতে চাই, কুরআনের শব্দচয়ন এতোই উচ্চ আঙ্গিকের যে, এটা অত্যন্ত উচ্চমানের।

ইন্টারনেটে বিভিন্ন বই পাওয়া যায়। আপনি ১২-২০ ব্যাকরণগত ভুল বইটি সেখান থেকে পড়তে পারেন। আপনি কি মনে করেন, খ্রিস্টানরা এসব ভুল গ্রহণ করেছে? আপনি কি জানেন কারা এসব ভুল গ্রহণ করছে? মুসলিমরা। মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ

Contents

যেমন, জামাক শরিক। তারা কী করেছিল– তারা বলেছিল, কুরআনের ব্যাকরণ এতোই উচ্চ মানের যে, এটা আরবি ব্যাকরণের প্রচলিত বই থেকে উন্নততর। তারা আরবি ব্যাকরণের প্রমাণ কুরআন থেকে দেয়ার জন্যে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর আমি আপনাদের দুটি উদহারণ দেব, যা আপনাদের ২০টি প্রশ্নেরই জবাব দেবে। তারা যে দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন তা হচ্ছে আমরা যখন কুরআন পড়ি তখন দেখতে পাই হযরত লূত (আ)-এর জাতির লোকেরা সকল নবীকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। এটা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল বলেছেন, নূহ (আ)-এর জাতি রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। আমরা ইতিহাস থেকে জানি যে, নূহ (আ)-এর জাতির নিকট একজন মাত্র নবীকে প্রেরণ করা হয়েছিল। সুতরাং এটি একটি ব্যাকরণগত ভুল। কুরআনে বলা উচিত ছিল নূহ (আ)-এর জাতির লোকেরা রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছিল বলা ঠিক হয়নি। আমি আপনাদের সাথে একমত যে, এটা ভুল হতে পারে। কিন্তু আপনারা যদি আরবদের রচিত বইগুলো পড়েন তাহলে জানতে পারবেন যে, কুরআনের সৌন্দর্য কী? পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য হচ্ছে কুরআন কেন 'রাসূল' শব্দের পরিবর্তে 'রাসূলদের' শব্দের ব্যবহার করছে সেটা। আপনারা জানতে পারবেন এটা কেন করা হয়েছে? কারণ, আমরা জানি যে, সকল রাসূলের মৌলিক বাণী একই রকম ছিল। যেমন, প্রভু একজন- আল্লাহর একত্ববাদ– আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এক ও একজন। হযরত লূত (আ)-এর জাতির লোকেরা রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এ কথার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, হযরত লূত (আ)-কে প্রত্যাখ্যান করে প্রকারান্তে তারা পরোক্ষভাবে সকল রাসূলকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। দেখুন সৌন্দর্য কাকে বলে? দেখুন অলঙ্কারিত্ব, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি ভাবতে পারেন এটি একটি ভুল। কিন্তু এটা কোনো ভুল নয়। একইভাবে কিছু কিছু লোক, যেমন আনিস সুরেয়া বলেছেন, কুরআন বলেছে যে, 'কুন ফা ইয়া কুন' অর্থাৎ, 'হও, অতঃপর হয়ে যায়।' এটা হওয়া উচিত ছিল 'কুন ফা ইয়া কানা।' অর্থাৎ, 'হয়ে যাও অতঃপর হয়ে গেল।' আরবিতে 'কুন' শব্দের অতীতকাল হচ্ছে কানা সুতরাং 'কুন ফা ইয়া কুন'-এর পরিবর্তে 'কুন ফা ইয়া কানা' বলা উচিত ছিল। কিন্তু 'কুন ফা ইয়া কুন' বলাটাই অধিকতর যুক্তিসংগত হয়েছে। কারণ এটা বলেছে যে, যা ছিল, আছে ও হবে সবকিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করতে পারেন। অর্থাৎ, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এ তিনকালকেই এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের প্রতি প্রশ্ন : আমরা জেনেছি যে যিশুর মন্ত্রণালয় ৩ বছর স্থায়ী ছিল। সুতরাং যিশু ছিলেন ঈশ্বরের পর দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি। তিনি যেহেতু স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র তাই তাঁর শৈশবকাল অর্থাৎ ১ বছর থেকে ২৭ কিংবা ২৮ বছর বয়স পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলো কী কী? উপস্থাপনার শুরুতেই আপনি পবিত্র কুরআনের সূরা কাহাফ থেকে যুলকারনাইনের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, যুলকারনাইন হচ্ছেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট। আপনি কি আমাকে এমন কোনো প্রমাণ দিতে পারবেন যে, যুলকারনাইনই হচ্ছেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট?

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : আমি এটা কেবল ইউসুফ আলীর ব্যাখ্যা পড়ে জেনেছি। কিন্তু আসলেই তিনি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট না-অন্য কেউ ছিলেন তা যথার্থভাবে বলা অসম্ভব। সূর্য বুধ কিংবা মঙ্গল গ্রহকে স্থাপন করেনি- এটাই সে বক্তব্য যা এ আয়াতটিতে বলা হয়েছে।

ডা. জাকির নায়েকের প্রতি প্রশ্ন : আমি বাইবেলের ধারাটি সঠিকভাবে জানি না। কিন্তু বাইবেল বলেছে, 'ইউনুস (আ) ৩ দিন ৩ রাত একটি মাছের পেটে ছিলেন, সেভাবে একজন মানুষ কি ৩ দিন ৩ রাত মাটির গর্তে থাকতে পারে।' যিশু কি বৈজ্ঞানিকভাবে ইউনুস (আ)-এর দৃষ্টান্ত পেশ করতে পেরেছিলেন।

ডা. জাকির নায়েক : এখানে যে বিষয়টি অবতারণা করা হয়েছে তার বর্ণনা ম্যাথিউ রচিত গসপেলের ১২তম অধ্যায়ের ৩৮ এবং ৪০ নং অনুচ্ছেদে রয়েছে। যখন লোকেরা যিশুখ্রিস্টকে বললো, 'আমাদের একটি নিদর্শন বা একটি অলৌকিক মুজেযা দেখান।' যিশুখ্রিস্ট বললেন 'তোমরা শয়তান এবং ইবলিসের সন্তান, তোমরা নিদর্শন দেখতে চাচ্ছ, তোমাদের কোনো নিদর্শন দেখানো হবে না। তবে ইউনুস (আ)-এর নিদর্শনের কথা বলছি। ইউনুস (আ) ৩ দিন ৩ রাত একটি তিমি মাছের পেটে ছিলেন, যেভাবে একটি শিশু মাতৃগর্ভে ৩ দিন ৩ রাত অবস্থান করতে পারে।' এটাই হচ্ছে ইউনুস (আ)-এর মুজিযা।

যিশুখ্রিস্ট তাঁর সমস্ত ডিমগুলোকে একটি থলের ভেতর রাখলেন। আর আপনি যদি ইউনুস (আ)-এর নিদর্শন সম্পর্কে জানতে চান তাঁর বর্ণনা দু'পৃষ্ঠারও কম যা আমরা সবাই জানি। আর আপনি যদি এটা বিশ্লেষণ করেন যে ইউনুস (আ) তিন দিন তিন রাত মাছের পেটে ছিলেন। কিন্তু যিশুখ্রিস্ট- আমরা গসপেলের বর্ণনা থেকে জানতে পারি, তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন। পড়ন্ত বিকেলে তাঁকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে আনা

Contents

হয়েছিল এবং পুণ্যসমাধিতে রাখা হয়েছিল। আর রোববার সকালের দিকে যদি আপনি তাকান তাহলে দেখতে পাবেন, পাথরগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছিল এবং তাঁর পূর্ণ সমাধি খালি পাওয়া গিয়েছিল। সুতরাং যিশু খ্রিস্ট সেখানে দুই রাত এবং একদিন ছিলেন। তাই এটা ৩ দিন ৩ রাত নয়।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল তার বইয়ে এর জবাব দিয়েছেন 'তুমি জান, দিনের যেকোনো একটি অংশ সমস্ত দিন হিসেবে গণনা করা যায়।' যদি কোনো রোগী আমার নিকট আসেন, কেউ শনিবার রাতে অসুস্থ ছিল কেউ সোমবার সকালে অসুস্থ থাকে। আর যদি আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কতক্ষণ ধরে অসুস্থ? 'তাহলে তিনি জবাবে বলবেন, ৩ দিন ধরে অসুস্থ।' আমি আপনার সাথে একমত সামঞ্জস্যপূর্ণ বক্তব্যে; এ ব্যাপারে আমি খুবই উদার। আপনি বলেছেন, দিনের একটি অংশ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ দিন। সুতরাং শনিবার রাত দিনের একটি অংশ– একদিন। রোববার দিনের একটি অংশ পরিপূর্ণ একটি দিন-একদিন ভালো। সোমবার দিনের একটি অংশও পরিপূর্ণ একটি দিন কোনো সমস্যা নেই।

রোগী যদি বলেন, ৩ দিন, কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু কোনো রোগীই কখনো বলবে না 'তিন দিন এবং তিন রাত।' আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে একথা বলতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ, আমি বিভিন্ন প্রকার রোগীর সাথে সাক্ষাৎ করে থাকি। আমি এমন কোনো একজন রোগীর সাথে সাক্ষাৎ পাইনি এমনকি কোনো খ্রিস্টান মিশনারি রোগীর সাথেও, যে কখনো আমাকে বলেছে যে, সে গত পরশু রাতে অসুস্থ হয়েছে। অর্থাৎ এমন বলেনি 'আমি ৩ দিন ৩ রাত ধরে অসুস্থ।' সুতরাং যিশুখ্রিস্ট বলেননি ৩ দিন। তিনি বলেছিলেন, ৩ দিন এবং ৩ রাত। সুতরাং এটি একটি গাণিতিক ভুল। বৈজ্ঞানিকভাবে যিশুক্রিস্ট এটা প্রমাণ করেননি। এছাড়া আরো বক্তব্য রয়েছে, ঐশী বাণীতে বলা হয়েছে ইউনুস (আ) মাছের পেটে ছিলেন যেভাবে মায়ের পেটে মানুষের সন্তান থাকে। কীভাবে ইউনুস (আ) একটি তিমি মাছের পেটে ছিলেন। মাছের পেটে জীবিত না, মৃত? জীবিত– যখন তাঁকে নৌকা থেকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল তখন তিনি জীবিত ছিলেন। তিমি মাছের পেটে, তিনি ছিলেন গভীর সমুদ্রে, জীবিত না মৃত? জীবিত। তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন তখন তিনি জীবিত না, মৃত? জীবিত! তাকে সমুদ্র তীরে উদগীরণ করা হয়েছিল– তখন তিনি জীবিত না মৃত ছিলেন। জীবিত! যখন আমি খ্রিস্টানদের জিজ্ঞেস করি যিশুখ্রিষ্ট কীভাবে পুণ্যসমাধিতে ছিলেন? জীবিত না মৃত?

তারা আমাকে বলেছেন, 'মৃত'। উপস্থিত দর্শকরা বলেছেন, 'জীবিত'। ডা. জাকির নায়েক সংক্ষেপে বলেছেন, 'জীবিত'? আলহামদুল্লিাহ! এটা কি খ্রিস্টবাদ? যদি তিনি জীবিতই থেকে থাকেন, আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হননি; আর যদি মৃত হয়ে থাকেন তা হলে তিনি তাঁর নিদর্শনকে পরিপূর্ণ করতে পারেননি। আপনারা এ সম্পর্কিত আমার ভিডিও ক্যাসেটটি দেখতে পারেন–'যিশুখ্রিস্ট কি সত্যিকার অর্থেই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।' আমি প্রমাণ করেছি যে যিশুখ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হননি। যেহেতু কুরআনের সূরা নিসার ১৫৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ .

অর্থ : তারা তাঁকে হত্যা করেনি, তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধও করেনি। এটা ছিল কেবল তাদের মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের প্রতি প্রশ্ন : একজন ডাক্তার হিসেবে আপনি কি বাইবেলে প্রদত্ত বিভিন্ন মেডিকেল সম্পর্কিত বিষয়গুলোর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবেন? কারণ পূর্ববর্তী আলোচনায় আপনি এসব বিষয়ের জবাব দেননি। উদাহরণস্বরূপ, রক্ত ব্যবহৃত হয় জীবাণুনাশক প্রতিষেধক হিসেবে। তিক্ত পানি দূষিত হওয়ার পরীক্ষা, আর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে যে মহিলারা পুত্র সন্তান জন্মদানের চেয়ে কন্যাসন্তান জন্ম দেয়ার প্রাক্কালে দ্বিগুণ সময় ধরে অপবিত্র বা হায়েজা অবস্থায় থাকে।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : প্রশ্নের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আর আমি এটা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ডা. জাকির নায়েক এমন কিছু প্রশ্ন রেখে গেছেন, যা খ্রিস্টানদের নিকট পরিষ্কার হওয়া উচিত। এটা বলা হয়েছে যে, পরবর্তী দিনে যখন একদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল, প্রস্তুতির পর প্রধান পুরোহিত এবং প্রবীণ ব্যক্তি একত্রিত হয়ে গেলেন। তারা বললেন, আমরা স্মরণ করছি, যখন তিনি জীবিত ছিলেন, তিনি বলেছিলেন, আমি ৩ দিন পর পুনরায় জীবিত হব। অতএব, সমাধিতে পানি দাও যাতে ৩ দিন সে তাতে নিরাপদ থাকতে পারে। সুতরাং তারা এসব শব্দের ব্যবহার করেছিল। এসব পরিবর্তিত অবস্থায় আমি উদ্বিগ্ন। এসব শব্দের সবগুলোই ৩ দিন, তৃতীয় দিনের পর, যিশুর কবরে যা ঘটেছিল তার সমান। তখন অন্য যে বিষয়টি ঘটেছিল তা হলো তাঁর পুনরুত্থান। সেখানে অন্য আরো একটি বিষয় ছিল– যখন বৃহস্পতিবার রাতে যিশুকে আবদ্ধ করা হয়েছিল।

এরপর বৃহস্পতিবার এবং বৃহস্পতিবারের পর– যখন তাঁকে আবদ্ধ করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন- 'আমার শেষ মুহূর্ত এসে গেছে।' আর এ কারণে আমি গণনা করেছিলাম যে ৩ দিন এবং ৩ রাত। এখন আপনি আমাকে বাইবেলে বর্ণিত এসব স্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, বাইবেল প্রভু কর্তৃক রচিত হয়েছে। আমি আরো বিশ্বাস করি, প্রভু এদের সেখানে স্থাপন করেছেন। সুতরাং প্রভু যা বলেছেন তার ব্যাখ্যা দেয়া আমার কাজ নয়। আমি বিশ্বাস করি, প্রভু এসব বিষয় সম্পর্কে তাঁর বাইবেলে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন।

ডা. জাকির নায়েকের প্রতি প্রশ্ন : বিবর্তনবাদ সম্পর্কে ইসলামের জবাব পড়ে আশ্চর্যান্বিত হই। 'বিবর্তনবাদ' এবং 'সৃষ্টিতত্ত্ব' সম্পর্কে ইসলাম কী বলে অনুগ্রহ করে আপনি ব্যাখ্যা করবেন কি?

ডা. জাকির নায়েক : ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল প্রশ্নোত্তর প্রদানে উদারনীতি গ্রহণ করেছেন। এমনকি আমিও প্রশ্নোত্তর দিতে উদারনীতি গ্রহণ করে থাকি। পবিত্র কুরআনের কোথাও 'আলেকজান্ডার'- এর নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 'জুলকারনাইন'। যদি কোনো কোনো ব্যাখ্যাকারী কোনো ভুল করে থাকেন তবে তা হচ্ছে ব্যাখ্যাগত ভুল। মানুষ ভুল করতে পারে কিন্তু প্রভু তাঁর কথায় কোনো ভুল করেন না। বাইবেলের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ইসায়ীতে বলা হচ্ছে– পৃথিবী গোলাকার। সমস্যা নেই– এতে বলা হয়েছে– গোলাকার, স্ফীত নয়। সুতরাং এক জায়গায় বাইবেল বলছে স্ফীত আবার অন্য জায়গায় বলছে গোলাকার। যদি আপনি দুটি বর্ণনার ব্যাপারেই একমত হন, তাহলে এটা গামলার মতো কিছু একটা হয়ে যায়। দেখুন গামলার আকার কি পৃথিবীর মতো? এটা গোলাকার এবং এটা স্ফীত– এটা পৃথিবীর আকারের অনুরূপ হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত কী বক্তব্য এসেছে এবং 'বিবর্তনবাদ' সম্পর্কে কী বলা হয়েছে– এ দুটি প্রশ্নই আমার ভাই আমার নিকট জানতে চেয়েছেন। জানি না আমি দুটি প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারব কিনা? আমি কিছু মনে করব না। আপনি কোন্ উত্তরটি চান? প্রথমটি না দ্বিতয়টি? জীববিজ্ঞান? নাকি বিবর্তনবাদ?

প্রশ্ন দুটি। প্রথমটি জীববিজ্ঞান এবং পরেরটি বিবর্তনবাদ। সঠিক উত্তর সম্পর্কে জানতে চাইলে, আপনি আমার 'The Quran and the modern science' শীর্ষক ভিডিও ক্যাসেটটি দেখতে পারেন। যখন আপনি বিবর্তনবাদ সম্পর্কে

আলোচনা করতে ইচ্ছুক, তখন আপনাকে অবশ্যই চার্লস ডারউইনের তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে। আর ডারউইন তার H. M. H. Bugle নামক জাহাজে চড়ে একটি দ্বীপের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বের হয়েছিলেন, যে দ্বীপের নাম 'Calatropis' এবং সেখানে তিনি দেখেছিলেন পাখিরা সুন্দরভাবে বিচরণ করছে। পাখির এ দৃশ্য অবলোকন করে তিনি ভাবলেন যে, পাখির লেজ কীভাবে লম্বা এবং ছোট হয়। এভাবে তিনি প্রাকৃতিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ব্যাপারে গবেষণা করলেন। কিন্তু তিনি তার বন্ধুর নিকট একটি পত্র লিখলেন। আমি আমার প্রাকৃতিক নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রমাণ দিতে পারবো না, কিন্তু ভ্রূণতত্ত্বের শ্রেণীবিন্যাসে এটা আমাকে সহায়তা করার কারণে আমি এ গবেষণা সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক।

যদিও ডারউইনের তত্ত্বটি আদৌ প্রতিষ্ঠিত সত্য নয়। এটা কেবল একটি তত্ত্ব। আর আমি আমার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের শুরুতেই একটি বিষয় পরিষ্কার করতে চাই 'কুরআন যেকোনো তত্ত্বের বিপরীতে যেতে পারে।' কারণ যেকোনো তত্ত্বের ইউ টার্ন বা বিপরীত মোড় নেয়ার সুযোগ থাকে কিন্তু কুরআন কোনো প্রতিষ্ঠিত সত্যের বিপরীতে যেতে পারে না। আর আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে ডারউইনের তত্ত্ব সম্পর্কে পড়েছি যেন এটি একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। কিন্তু এটা কোনো প্রতিষ্ঠিত সত্য নয়। এটির কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই– এতে কিছুটা ভুল ধারণার সংযুক্তি ঘটেছে। যদি কেউ তার বন্ধু বা সহকর্মীকে অপমান করতে চায় , তাহলে সে বলবে– 'যদি তুমি ডারউইনের সময় উপস্থিত থাকতে তাহলে ডারউইনের তত্ত্বটি সঠিক বলে প্রমাণ করতে চাইতে'।

আর আমি চারটি জীবাশ্ম সম্পর্কে জানি, যেগুলো এখনো রয়েছে। এ চারটির বিস্তারিত বিবরণ আমি আমার ভিডিও ক্যাসেটে প্রদান করেছি। জীববিজ্ঞানে হেনসিস ক্রয়েব বলেছেন, এটা অসম্ভব যে আপনি বানর থেকে রূপান্তরিত হয়েছেন ডিএনএ-এর কোড অনুযায়ী–এটা অসম্ভব। আপনারা আমার ভিডিও ক্যাসেটটি দেখতে পারেন- যাতে বিস্তারিত বিবরণ পাবেন। তবে বেশ কয়েকটি অংশের ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই। জীববিজ্ঞান বা জীবতত্ত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা আম্বিয়া এর ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۔

Contents

অর্থ : আমি প্রতিটি জীবন্ত জিনিসকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছি–তারপরও কি তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে না?

এখানে মৌলিক কথা হলো- দেহের প্রতিটি কোষেই সাইটোপ্লাজম থাকে, যার ৯০%-ই পানি। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি জীবন্ত বস্তুর দেহেরই ৫০% থেকে ৯০% পর্যন্ত পানি। চিন্তা করে দেখুন, আরবের মরুভূমিতে বসে কে ভাবতে পারে যে সকল বস্তুকেই পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে? অথচ পবিত্র কুরআন একথা ১৪শত বছর পূর্বেই ঘোষণা দিয়েছে।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের প্রতি প্রশ্ন : আপনি যদি সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে ওল্ড টেস্টামেন্টের বক্তব্যের বিপরীত ধারণার ব্যাপারে উত্তর দিতে না পারেন, তাহলে কি এটা প্রমাণিত হয় না যে বাইবেল প্রভুর পক্ষ হতে আসেনি এবং বাইবেল অবৈজ্ঞানিক?

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্বেল : আমি স্বীকার করি, এ বক্তব্যের ব্যাপারে আমার বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে, কিন্তু আমার আরও কতিপয় পরিপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে–যেগুলো আমার নিকট গুরুত্বপূর্ণ। এসব বক্তব্যে বলা হয়েছে, যিশু হচ্ছেন মূল ভিত্তি। আর তাঁর বারোজন শিষ্যের সমন্বয়ে গঠিত ইমারতের একটি ভিত্তিপ্রস্তর তিনি। সুতরাং যিশু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং ঐ বারোজন সাথী তার বাণী লিখেছিলেন, যখন প্রভু নবুয়তের পরিপূর্ণতা প্রদান করেছিলেন। আমি জানি যে, এ বক্তব্য আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয় না, কিন্তু আমার খ্রিস্টবাদে বিশ্বাস হচ্ছে, যিশুখ্রিস্টই হচ্ছেন আমার ত্রাণকর্তা।

ডা. জাকির নায়েকের প্রতি প্রশ্ন : 'পাঠ্যবই' এবং 'অনুবাদ'–এ দুটি ভিন্ন শব্দ, দুটি ভিন্ন অর্থ প্রদান করে। বাইবেলের ইংরেজি ভাষায় 'একটি পাঠ্য বই' কিংবা 'একটি অনুবাদ' রয়েছে। বৈজ্ঞানিকভাবে 'পাঠ্যবই' এবং 'অনুবাদ' উভয়কে একই হিসেবে প্রমাণ করা যায় কি? প্রভু তাঁর বাণীকে ঈসা এবং মূসা (আ)-এর নিকট কি ইংরেজিতে নাযিল করেছিলেন?

ডা. জাকির নায়েক : একটি সুন্দর প্রশ্ন–'পাঠ্যবই' এবং 'অনুবাদ' কি একই হতে পারে? 'না'। একটি 'পাঠ্যবই' এবং 'অনুবাদ' যথাযথভাবে এক হতে পারে না বরং তারা একই হওয়ার কাছাকাছি আসতে পারে। আব্দুল মজিদ দারিয়াবাদীর মতে, পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করা, কারণ-এর ভাষা

হচ্ছে অত্যন্ত বাগ্মিতাপূর্ণ। এটি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের এবং মহিমান্বিত। এছাড়া আরবিতে ব্যবহৃত একটি শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে।

আসলে পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করা যেহেতু অত্যন্ত কঠিন কাজ–তাই এর অনুবাদ এবং পবিত্র কুরআন অবশ্যই এক জিনিস নয়। আর অনুবাদে কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি হলে, সেটা নিতান্তই মানুষের করা ভুল। যে মানুষ অনুবাদ করতে গিয়ে ভুল করবে এজন্য তাকেই দোষী সাব্যস্ত করতে হবে। কিন্তু এজন্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। প্রাসঙ্গিকভাবে যা বলা দরকার তা হলো, বাইবেল কি ইংরেজিতে অবতীর্ণ হয়েছিল? 'না', বাইবেল ইংরেজিতে অবতীর্ণ হয়নি। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট অবতীর্ণ হয়েছে, হিব্রু ভাষায় এবং নিউ টেস্টামেন্ট গ্রিক ভাষায়।

আমরা জানি, যিশুখ্রিস্ট হিব্রু ভাষায় কথা বলতেন। আর বাইবেলের প্রকৃত যে পাণ্ডুলিপিটি এখন আছে তা হচ্ছে গ্রিক ভাষায় লিখিত। বস্তুত ওল্ড টেস্টামেন্ট হিব্রু ভাষায় লিখিত হয়েছিল যা এখন আর সচরাচর পাওয়া যায় না। আপনারা কি এটা জানেন যে, হিব্রু ভাষায় ওল্ড টেস্টামেন্টের যে অনুবাদ পাওয়া যায় তা গ্রিক ভাষা থেকে সংগৃহীত? সুতরাং প্রকৃত ওল্ড টেস্টামেন্ট যা হিব্রু ভাষায় রচিত হয়েছিল তা বর্তমানের হিব্রু ভাষায় নয়।

আলহামদুলিল্লাহ, প্রকৃত আরবি ভাষাই পবিত্র কুরআনে সংরক্ষিত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ, এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে, আপনিও এভাবে প্রমাণ করতে পারবেন। আরও একটি প্রশ্ন করা হয়েছে–যিশুখ্রিস্ট এবং মূসা (আ)-এর প্রতি সত্যিকারভাবেই কি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল? পূর্ববর্তী প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলাম এবং আমি যা বিশ্বাস করি, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবা আয়াত ১১১, সূরা আম্বিয়া আয়াত ১০৫ সহ বিভিন্ন সূরায় ৪টি কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। কিতাবগুলো হলো– তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন।

তাওরাত হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত ওহী, যা হযরত মূসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল। যাবুর হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত ওহী, যা হযরত দাউদ (আ)-এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। ইঞ্জিলও ওহী, যা হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং কুরআন হচ্ছে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ওহী, যা সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান বাইবেল প্রকৃত ইঞ্জিল নয়,

যার সম্পর্কে আমরা এ বিশ্বাস পোষণ করি যে তা হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : ইঞ্জিল হচ্ছে একটিই যা সর্বদাই ছিল। ১৮০ খ্রিস্টাব্দের ৭৫% মূল ইঞ্জিল আমাদের নিকট আছে- যা জন লেয়ার-এর ১০০ বছর পরের। ঐ সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন এবং লিখেছিলেন। ঐ সময় আপনাদের পূর্বপুরুষরা জীবিত ছিলেন, যারা জন-এর নিকট থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এটাই একটা ভালো উদাহরণ এবং একটি ভালো পাঠ্য। বাইবেল হচ্ছে একটি সত্য ইতিহাস। এখন প্রশ্ন হচ্ছে- আপনি যে সম্ভাবনার কথা বলেছেন সেটা একটা বড় ধরনের গণনা- আপনাকে ধন্যবাদ। প্রভু সর্বশক্তিমান এবং তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। এতে অবশ্যই ধনী, কিংবা দরিদ্র কিংবা অন্য কিছুর বিষয়ই বিবেচ্য নয়। সুতরাং কীভাবে আপনার সম্ভাবনার বিষয়টি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে? যিশু গরিব ছিলেন-তাকে মনোনীত করা হয়েছিল। তিনি বলতেন "একজন মানুষের সন্তান এমন কোন নির্দিষ্ট জায়গা নেই যেখানে সে মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবে।" এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই- আমি দেখি না কীভাবে একটি গণনার মাধ্যমে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়। গণনা ছিল এমন যে কিছু লোক এসব ভবিতব্য বিষয় পরিপূর্ণ করতে পারে। আমি আশা করি এটা সাহায্যকারী হবে।

ডা. জাকির নায়েকের প্রতি প্রশ্ন : এমন কী কী বিষয় আছে, যার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, কুরআন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? আধুনিক বিজ্ঞান ভুল হলে কী ঘটাতে পারে? বিজ্ঞানের পরিবর্তনকে কি কুরআন সর্বদা পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিফলিত করে?

ডা. জাকির নায়েক : অত্যন্ত ভালো এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আর আমরা মুসলমানরা কুরআনের সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গতি বিধানের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হব। অতএব, আমি আমার আলোচনার শুরুতেই বলেছি- আমি কেবল ঐসব বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ব্যাপারেই আলোচনা করবো, যেগুলো প্রতিষ্ঠিত, এরকম একটি প্রতিষ্ঠিত সত্যের উদাহরণ হচ্ছে-পৃথিবী স্ফীত আকারের। এটা কখনো ভুল হতে পারে না। প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কখনোই ইউ-টার্ন করতে পারে না। কিন্তু অপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান যেমন Hypothesis এবং Theory ইউ-টার্ন নিতে পারে অর্থাৎ পরিবর্তিত হতে পারে।

কতিপয় মুসলিম পণ্ডিতের কথা আমি জানি, যারা ডারউইনের তত্ত্বকে পবিত্র কুরআনের দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং আমাদের উল্টো দিকে যাওয়া

উচিত নয় এবং আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানের সবকিছুকেই প্রমাণ করার চেষ্টা করা ঠিক নয়। আমাদের অধিক সতর্ক হতে হবে, যাতে আমরা কোন্‌টি প্রতিষ্ঠিত এবং কোন্‌টি অপ্রতিষ্ঠিত তা যাচাই করতে পারি। যদি এটা প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান হয়, আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে এটার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ থাকবে এবং কুরআন কখনোই এর বিপরীতে যাবে না। আর যদি এটা কাল্পনিক বা ধারণাসূচক হয়, তাহলে এটি সঠিকও হতে পারে, আবার ভুলও হতে পারে। যেমন, 'বিগ ব্যাঙ' তত্ত্বও, যেটি প্রাথমিক পর্যায়ে ধারণাসূচক বা কাল্পনিক ছিল। বর্তমানে এ তত্ত্বটির যথার্থ প্রমাণের পর, স্টিভেন হকিংসের মতানুযায়ী—এটি একটি সত্যে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে 'বিগ ব্যাঙ' তত্ত্বটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য, যা ইতোপূর্বে একটি Hypothesis বা কল্পনাসূচক ছিল। তাহলে এটি আমি ব্যবহার করতে পারি একবার যদি কোনোটি সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

একটি কল্পনা-ধারণা প্রচলিত আছে। যেমন বলা হয়ে থাকে- 'মানুষ জাতিকে এক জোড়া মানুষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে—আদম ও হাওয়া।' আমি এ ধারণাটি ব্যবহার করি না, কারণ বিজ্ঞান এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এটা কুরআনের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, আমাদের এক জোড়া মানব- আদম ও হাওয়া (আ) থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু আমি এ উদাহরণ দিই না, কারণ এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য নয়। সুতরাং যখন কুরআন এবং বিজ্ঞানের সাথে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন আপনি এসব বিষয়ের মাঝেই সম্পর্ক স্থাপন করতে চান যেগুলো প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সত্য এবং ধারণাসূচক কোনো তত্ত্ব নয়। কারণ, কুরআন আধুনিক বিজ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি উৎকৃষ্টতর। আমি বিজ্ঞানের সাহায্যে এটা প্রমাণ করতে চাই না যে, পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী- না, না, আদৌ না। তাহলে আমি কী করতে চাচ্ছি? আমাদের মুসলমানদের নিকট কুরআন হচ্ছে চূড়ান্ত ফায়সালা। পক্ষান্তরে নাস্তিক কিংবা অমুসলিমদের জন্যে বিজ্ঞান হতে পারে চূড়ান্ত ফায়সালা। আমি এখানে যে বিষয়টির কথা বলছি তা হচ্ছে—নাস্তিকদের মানের মাপকাঠি এবং তাদের মুসলমানদের মানের মাপকাঠির সাথে তুলনা করছি যেমন, পবিত্র কুরআন।

পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী- আমি বিজ্ঞানের সাহায্যে এটা প্রমাণ করতে চাচ্ছি না। আমি যা প্রমাণ করার চেষ্টা করছি তা হচ্ছে- যখন আমি তুলনামূলক আলোচনা নিয়ে আসি, তখন আমি কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করি। আর সেক্ষেত্রে আমি দেখাই যে, তোমাদের বিজ্ঞান যা গতকাল আমাদের শিক্ষা দিয়েছে, পবিত্র কুরআন

তা শিক্ষা দিয়েছে ১৪০০ বছর পূর্বে। আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করি যে, আমাদের মুসলমানদের মানের মাপকাঠি অর্থাৎ পবিত্র কুরআন তোমাদের মানের মাপকাঠি অর্থাৎ বিজ্ঞান থেকে অনেক বেশি উৎকৃষ্টতর। সুতরাং আপনাদের অনেক বেশি উৎকৃষ্টতর কুরআনের বক্তব্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত।

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেলের প্রতি প্রশ্ন : ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল ডা. জাকির নায়েকের সাথে একমত হয়েছেন যে, তিনি যেসব ভুল দেখিয়েছেন তা আসলে ভুল নয় এবং তিনি সেসবের উত্তর দিতে পারেননি। তার মানে কি ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, বাইবেলে ভুল রয়েছে এবং বাইবেল প্রভুর বাণী নয়?

ডা. উইলিয়াম ক্যাম্পবেল : বাইবেলে এমন কতিপয় বিষয় রয়েছে যেগুলোর ব্যাখ্যা আমি দিতে পারবো না– যেগুলোর জবাব এ মুহূর্তে আমি দিতে চাই না। আর আমি অপেক্ষা করছি যতক্ষণ পর্যন্ত এর একটি জবাব আসে। এমন কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয় রয়েছে যেগুলো প্রমাণ করে যে বাইবেল সত্য, যেমন– শহরের বর্ণনা, কে রাজা, এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়সমূহ। আর আমি মনে করি এটাই বড় প্রমাণ যে বাইবেল ঐতিহাসিকভাবে সত্য।

ডা. জাকির নায়েকের প্রতি প্রশ্ন : 'বাইবেলে আরো কোনো গাণিতিক বৈপরীত্য বিদ্যমান আছে কি?' 'ইসলামে কি আরও কোনো গাণিতিক বৈপরীত্য বিদ্যমান আছে'? এটা কি বাইবেলে আছে না ইসলামে আছে?

ডা. জাকির নায়েক : আমি উভয় প্রশ্নেরই উত্তর দেব। কারণ 'সেখানে আরও অধিক কিছু আছে কি?' এটা বাইবেলের ক্ষেত্রেই হওয়া উচিত। কারণ, আমি বৈপরীত্য সম্পর্কে আলোচনা করছি। যাহোক, ইসলাম প্রসঙ্গে আসা যাক। পবিত্র কুরআনের ৪নং সূরা নিসার ৮২ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ـ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ـ

অর্থ ঃ তারা কি সযত্নে কুরআনের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না?– এটা যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে অবতীর্ণ হতো তা হলে তারা এতে অনেক বৈপরীত্য পেত।

অতএব পবিত্র কুরআনের কোথাও বৈপরীত্য নেই। এবার বাইবেলের মধ্যে বৈপরীত্য সম্পর্কে আলোচনায় আসা যাক। পাঁচ মিনিট এ আলোচনার জন্যে পর্যাপ্ত সময় নয়। এমনকি যদি তারা আমাকে পাঁচদিন সময় দেয়, তাহলেও এ আলোচনার শেষ হবে না। যাহোক, আমি মাত্র কয়েকটি পয়েন্ট এখানে উল্লেখ করব।

2nd Kings-এর ৮ম অধ্যায়ের, ২৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে, 'আহেজিয়া ছিল ২২ বছর বয়সের যখন সে রাজত্ব শুরু করেছিল।' 2nd Chronicles-এর ২২তম অধ্যায়ের ২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'সে ছিল ৪২ বছর বয়সের, যখন সে রাজত্ব শুরু করেছিল।' এখন প্রশ্ন হলো, সে কি ২২ বছর বয়সের ছিল, না ৪২ বছর বয়সের? এটা নিঃসন্দেহে গাণিতিক বৈপরীত্য। এছাড়া 2nd Chronicles-এর ২১তম অধ্যায়ের ২৩নং অনুচ্ছেদে এটা বলেছে– 'জোরাম, আহেজিয়ার পিতা তার ৩২ বছর বয়সে রাজত্ব করা শুরু করেছিলেন আর তিনি ৮ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। অবশেষে ৪০ বছর বয়সে মারা যান। তাৎক্ষণিকভাবে আহেজিয়া তার ৪২ বছর বয়সে পরবর্তী শাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এখন, পিতা ৪০ বছর বয়সে মারা গেলে তার পরপরই পুত্র ৪২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। কীভাবে পুত্র পিতার চেয়ে দুই বছরের বেশি বয়সের হতে পারে? আমার কথা বিশ্বাস করুন, এমনকি হলিউডের কোনো ফিল্মেও আপনি এমন কোনো আজগুবি কাহিনী সৃষ্টি করতে পারবেন না। হলিউড ফিল্মে, আপনি ইউনিকর্ন (একশৃঙ্গ) সৃষ্টি করতে পারেন, যার বিবরণ আমি আমার আলোচনায় উপস্থাপন করেছি। ইউনিকর্ন আপনি কনক্রোড়ায়াসিস করতে পারেন, যার সম্পর্কে বাইবেল আলোচনা করছে। আপনি হলিউডে কনক্রোড়ায়াসিস, ড্রাগন এবং সারপেন্টের চিত্র দেখতে পাবেন। কিন্তু আপনি কি হলিউডের কোনো ফিল্মে এটা দেখতে পাবেন যে কোনো পুত্র তার পিতার চেয়ে দুই বছরের বড়? এমনকি এটা কোনো মোজেজাও হতে পারে না। অলৌকিকভাবেও এটা হওয়া সম্ভব নয়। অলৌকিকত্বে, আপনি দেখবেন, এখন কুমারী মায়ের পেটে শিশু জন্ম নিচ্ছে, কিন্তু একজন পুত্র তার পিতার চেয়ে দুই বছরের বড় এটা দেখবেন না।

যদি আপনি পড়েন, তাহলে দেখবেন বাইবেলের 2nd Samuel-এর ২৪তম অধ্যায়ের ৯নং অনুচ্ছেদে বলা আছে– 'যেসব লোক যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিল, তাদের মধ্যে ৮০০ হাজার লোক ইসরাঈলি এবং ৫০০ হাজার লোক বিশ্বাসঘাতক।' যদি আপনি অন্য জায়গায় দেখেন তাহলে দেখবেন 1st

Contents

Chronicles-এর ২১তম অধ্যায়ের ৫ম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে '১ মিলিয়ন একশত হাজার লোক যুদ্ধক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করেছিল, যারা ছিল ইসরাঈলি। আর দশ হাজার চারশত ষাটজন লোক ছিল জুডস বা বিশ্বাসঘাতক।' এখন প্রশ্ন হলো, 'যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী ইসরাঈলিদের সংখ্যা কি ৮০০ হাজার না ১ মিলিয়ন ১০০ হাজার ছিল? আবার জুডসের সংখ্যা কি ৫ লাখ ছিল, না ১০,৪৬০ জন ছিল? এটা পরিষ্কার একটি বৈপরীত্য। আরও একটি বৈপরীত্য হলো, বাইবেলের 2nd Samuel-এর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– 'সউলের কন্যা মিশেলের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না।' একই বইয়ের ২১তম অধ্যায়ের ৮নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– 'সউলের কন্যা মিশেলের পাঁচটি পুত্র সন্তান ছিল।' এক জায়গায় বলছে, 'কোনো পুত্র সন্তান ছিল না' আবার অন্য জায়গায় বলছে '৫ পুত্র ছিল' -এটা বৈপরীত্য।

আরও একটি বৈপরীত্যের কথা বলছি। যদি আপনি পড়েন, তাহলে দেখবেন ম্যাথিউ রচিত গসপেলের ১ম অধ্যায়ের ১৬ নং অনুচ্ছেদে যিশুখ্রিস্ট-এর বংশবৃত্তান্ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আবার লূক-এর ৩য় অধ্যায়ের ২৩নং অনুচ্ছেদে এটি বলছে, 'যিশুর পিতা ছিলেন জ্যাকব'। ম্যাথিউ-এর ১ম অধ্যায়ের ২৬নং অনুচ্ছেদে এবং লূক-এর ৩য় অধ্যায়ের ২৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'যিশুর পিতা ছিলেন হ্যাইলি।' এখন প্রশ্ন হলো, 'যিশুর কি দুজন পিতা ছিলেন? যে যিশুর দু'জন পিতা আপনি তাকে কী ডাকবেন? অথবা তার পিতা কি জ্যাকব না হ্যাইলি? এটি একটি পরিষ্কার বৈপরীত্য।

more coming .....